জামাতের মসজিদ টার্গেট ও বাউরী বাতাস

গোলাম কিবরিয়া পিনু

জামাতের গোপন
দলিল-দস্তাবেজ
থেকে টেনে আনা তথ্যে
আর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে এই
বইয়ের ক'টি প্রবন্ধ
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায়
উদ্দীপ্ত পাঠকের ভূমিকাকে
শাণিত করবে।
শুধু জামাত নয়,
ইসলামের নামে
তথাকথিত নতুন
কাণ্ডারিদের অতীত,
মুখোশ, চারিত্র্য, তাদের
পত্র-পত্রিকা ও ভূমিকাকে
চিহ্নিত করা হয়েছে।
আওয়ামী লীগ, বিএনপি,
সিপিবি, গণফোরামের
উদ্যোগ, দৃষ্টিভঙ্গী ও
ভূমিকাকে বিভিন্ন
রাজনৈতিক ঘটনার
প্রতিক্রিয়ায় আলাদা
আলাদা ভাবে বিশ্লেষণ
করা হয়েছে।
বইটিতে লেখক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ
সংহত গদ্যে মুক্তিযুদ্ধ,
ইতিহাস, রাজনীতি ও
সমাজের বিভিন্ন ভূমি
টেনে-খুঁড়ে নিয়ে বিবেক-
ব্যঞ্জনায় এক ঐক্যভূমি
সৃষ্টি করেছেন। সেই
ঐক্যভূমি শুধু লেখকের
নয়, পাঠকেরও।

৪৫.০০

বইয়ের সব ক'টি
প্রবন্ধ জাতীয়
দৈনিকে প্রকাশিত।
বেশীর ভাগ আজকের
কাগজে ছাপা,
বাকীগুলো বাংলার বাণী
ও ভোরের কাগজে।

লেখকের অন্যান্য বই

কবিতা

এখন সাইরেন বাজানোর সময়
সোনামুখ স্বাধীনতা
পোর্ট্রেট কবিতা
সূর্য পুড়ে গেল

ছড়া

খাজনা দিলাম রক্তপাতে
ঝুমঝুমি

জন্ম

১৬ চৈত্র ১৩৬২
গাইবান্ধা

জামাতের মসজিদ টার্গেট ও বাউরী বাতাস

গোলাম কিবরিয়া পিনু

মনোজ

জামাতের মসজিদ টার্গেট
ও বাউরী বাতাস

গোলাম কিবরিয়া পিনু

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৪০১
ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫

প্রকাশক
মনোজ
এস এম সি এন্টারপ্রাইজ
৭, লারমিনি ষ্ট্রীট, ওয়ারী, ঢাকা।

প্রচ্ছদ
জামির জাফরি

অক্ষর বিন্যাস
এম এ কম্পিউটার
১৬৪/১ ডি আই টি (এক্সঃ) রোড
ঢাকা-১০০০

মুদ্রণ
আলম প্রিন্টিং প্রেস
২২/এ টিপু সুলতান রোড
ঢাকা-১১০০

মূল্য
পঁয়তাল্লিশ

JAMATER MASJID TARGET, O BAWRI BATAS (Mosque as target of Jamat and the Whirling Wind) A Collection of Eassy's by GOLAM KIBRIA PINU, Published by MONOJ, WARI, DHAKA.

মানুষরূপী ধর্মান্ধ পশুদের হিংস্রতায়
নিহত শহীদদের স্মরণে

এরা ক্রোধে মত্ত
এরা গিরগিটি
এরা ঘড়িয়াল,
এদের আওতায় জলাশয় রাখা যায় না।
এমন ঘণ্টা বাজাও
এরা যেন বধির হয়ে যায়,
এমন আলো জ্বালো
এরা যেন অন্ধ হয়ে যায়।

সূচী

জামাতের মসজিদ টার্গেট ও প্রতিরোধমুখী ভূমিকা

মসজিদে আজ জামাতের কালজ্ঞ-ছায়া পড়েছে, যে ছায়ায় মসজিদ হয়ে উঠেছে ওদের সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলীয় অবস্থান, সেখানে তারা বিভিন্ন ফতোয়া দিচ্ছে, ধর্মের আলখাল্লা পরে ধর্মপ্রাণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। প্রয়োজনে মুসল্লিদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে এক ধরনের তথাকথিত জিহাদী জোস আনার চেষ্টায় পাগল হয়ে উঠেছে। দুঃখজনক টার্গেট হিসাবে মসজিদ ওদের ঘৃণ্য নখরের আওতায় পড়েছে।

কেন ওরা মসজিদকে টার্গেট করছে? টার্গেট করছে এ কারণে যে, মসজিদ এদেশের একটি শক্তিশালী ও বিস্তৃত প্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানের অবকাঠামো শহর-বন্দর-গ্রাম-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে রয়েছে। জামাত মুক্তিযুদ্ধের আগে থেকে মসজিদকে কেন্দ্র করে কু-কৌশলে সমাজে আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে, পরবর্তীকালে যখন ওদের প্রকাশ্য রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালানো নিষিদ্ধ থাকে, তখন তারা মসজিদকে গোপনীয় কাজ চালানোর নিরাপদ স্থান বলে ভাবে।

মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে জামাত মানুষের দৃষ্টিতে ঘৃণ্য আর শয়তানী-শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, এর ফলে—তারা সমাজ-বিচ্ছিন্ন অন্ধকারের প্রাণী হিসেবে পরিণত হয়। এই অন্ধকারের প্রাণীরা মসজিদের শান্তির পরিবেশে, মানুষের দৃষ্টির অলক্ষ্যে অবস্থান নিতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে ও মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতায় এরা মনুষ্যরূপী শয়তান, ধর্মতো দুরের কথা, নিম্নতম মানবিক গুণ এদের নেই। তাই, তারা সাধারণ মানুষের সবচাইতে পবিত্র স্থান বলে চিহ্নিত মসজিদে গিয়ে উপস্থিত হয়ে ধর্মীয় আলখাল্লায় নিজেদের আসল চেহারা লুকিয়ে রেখে লোকজনের সঙ্গে মিশতে শুরু করে। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর দেশ যখন উল্টো স্রোতে যেতে লাগলো, তখন সেই সময়ের শাসকরা ও এদের দোস্তরা বহুমুখী লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধের মূল-লক্ষ্যকে নষ্ট আর বিকৃত করে। রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ভেদবুদ্ধি নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা নিশ্চিত করার জন্যে সুযোগ-সুবিধে একের পর এক খুলে যায়। এর ফলে কালজ্ঞ-শক্তি জামাত বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া রাজনৈতিক অধিকার ফিরে পেয়ে সংগঠন করার প্রকাশ্য সুযোগ পায়। এ সুযোগে পরাজিত চিহ্নিত শত্রু জামাত নতুন সাংগঠনিক কলা-কৌশলে মসজিদকে বিশেষ ভাবে প্রাধান্য দেয়। মসজিদকে হীন উদ্দেশ্যে টার্গেট করায় এবং সে অনুযায়ী

মসজিদকে কাজে লাগিয়ে তারা প্রাথমিকভাবে সফল হয়, এই সফলতার ভিত্তিতে তারা আজ তাদের সাংগঠনিক শক্তিকে শক্ত ভিত্তির ওপর অনেকটা দাঁড় করাতে সক্ষম হয়েছে।

মসজিদকে জামাতই বিশেষ টার্গেটে এনে গুরুত্ব দিয়েছে। অন্য কোন রাজনৈতিক দল-সংগঠন সেভাবে গুরুত্ব দেয় নি। জামাত তাদের প্রকাশিত 'সংগঠন পদ্ধতি' নামক পুস্তকে বলেছেঃ ''মসজিদ জনপ্রিয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান। এখানে বিশেষ করে দীনদার লোকগণ নিয়মিত উপস্থিত হন। তাদের নিকট দাওয়াত পৌঁছানোর জন্যে মসজিদকে কেন্দ্র করে আমাদেরকে খুবই তৎপর হওয়া প্রয়োজন। নিয়মিত তাফসীর চালু, জুমযায় খুতবা বাংলায় তর্জমা, ইসলামি পাঠাগার স্থাপন, ফুরকানিয়া মাদ্রাসা পরিচালনা, বিভিন্ন ইসলামি দিবস (দিন ও রাত্রি) উদযাপন। এসব কাজের মাধ্যমে মসজিদ কেন্দ্রিক দাওয়াতী কাজ করা যেতে পারে। এজন্যে মসজিদের ইমাম, মুয়ায্যিন, মুতাওয়াল্লি এদের উপরেও সরাসরি দাওয়াতী কাজ করা প্রয়োজন। এ কাজগুলো করতে হলে মসজিদের আশেপাশের কর্মীদেরকে নিয়মিত জামায়াতে উক্ত মসজিদে নামায আদায় করা প্রয়োজন।" আশ্চর্য! কু-কৌশলে ধর্মপ্রাণ মানুষের প্রতিষ্ঠান মসজিদকে করায়াত্ত করার জঘন্য দলীয় সাংগঠনিক প্রয়াস!

মসজিদকে দখল করার জন্যে তারা অনেক মসজিদের সরল ইমামকে দলে টানছে বা টেনেছে, দলে টানছে বা টেনেছে মুয়াযযিন-মুতাওয়াল্লিকে, উল্লিখিত জামাতের পুস্তিকা থেকে নেয়া বক্তব্য থেকে তার প্রমাণ মেলে। প্রমাণ মেলে বরিশাল মেডিকেল কলেজের জামে মসজিদের পেশ ইমাম মোখলেসুর রহমানের শহীদ জননী জাহানারা ইমাম সম্পর্কিত কটুক্তি থেকে। দুঃসাহস আর রাজনৈতিক হীনস্বার্থে এই ইমাম শহীদ জননীকে 'জাহান্নামের ইমাম' বলে কটুক্তি করে। এ ইমাম নিশ্চয় জামাতের মসজিদ কর্মী বা নেতা বা জামাতের মওদুদীবাদ দ্বারা পথভ্রষ্ট মুসলমান, যার কণ্ঠে জামাতের সাঈদী-গংদের সুর-ব্যঞ্জনায় পুলকিত অভদ্রসূচক-রুচিহীন-শব্দ-বাক্য তৈরি হয়েছে, একজন মুসলমান-মহিয়সী-যোদ্ধা শহীদ জননী সম্পর্কে। তাও আবার মসজিদে, পেশ ইমামের কণ্ঠ থেকে। মসজিদ ও ইমামের এই অবস্থার জন্যে দায়ী ইসলাম বিরোধী মওদুদী-ভাবনা দ্বারা চালিত অপশক্তির উত্থান ও প্রভাব। অবশ্য আশার কথা; সাধারণ মুসল্লিরা, যাঁরা রাজনৈতিক দলাদলি ও সংকীর্ণতার উর্ধ্বে রেখে মসজিদকে পবিত্র রাখতে চান, তাঁদের সচেতন প্রতিরোধে অবশেষে সেই ইমাম ক্ষমা প্রার্থনা করে শহীদ জননীর আত্মার মাগফেরাত কামনায় বিশেষ মোনাজাত করে। জামাত বিভেদ আর বিভক্তি নিয়ে এসে মসজিদকেও নষ্ট-ছায়ায় অপবিত্র করতে পিছপা হচ্ছে না; তাদের পুরনো অমানবিক আর হিংস্র আঘাত হানার জন্যে।

জামাতের প্রভাব থাকলেই সেইসব মসজিদে মোনাজাতের ভাষা পাল্টে যায়, দলীয় রাজনৈতিক অভিসন্ধিমূলক বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা অনেক মুসল্লির রয়েছে। কিন্তু শান্তি প্রিয় ও উদার মনোভাবের কারণে সরাসরি প্রতিবাদে না গিয়ে, অনেক মুসল্লি তাঁর ক্ষোভ নিজের ভেতরে ধরে রাখেন। এ ক্ষোভ দিন দিন বাড়ছে। আবার যেসব মসজিদের ইমাম জামাত বিরোধী, সেসব মসজিদে জামাতের লোকজন নামাজ পড়তে যায় না, আবার এমনও উদাহরণ আছে যে, জামাত-বিরোধী ইমামকে উৎখাত করার জন্যে বিভিন্ন কু-কৌশলে জামাতরা শয়তানী শুরু করে। মসজিদকে নিয়ে জামাতের এ আগুন খেলা কবে শেষ হবে?

জামাত তাদের 'সংগঠন পদ্ধতি' নামক পুস্তিকায় আরো বলেছে যেঃ 'যেখানে আমরা কাজ করি সেখানে এক বা একাধিক মসজিদ আছে। অধিকাংশ মসজিদে দুই ধরনের সমস্যা দেখা যায়। (ক) অজু-এস্তেঞ্জার অব্যবস্থা, জায়গার অভাব, চলাচলের কষ্টকর পথ, মেরামতের অভাব, ইমাম-মোয়াজ্জেনের অল্প বেতন ও থাকার সমস্যা ইত্যাদি। (খ) অযোগ্য ও লোকদের পরিচালনা। সংগঠনকে উভয়বিদ দুর্বলতা দূর করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। এলাকার লোকদেরকে সাথে নিয়ে সংগঠন এ কাজগুলো করবে। এভাবে এগিয়ে আসলে মসজিদগুলোকে আল্লাহর দ্বীনের সত্যিকার কেন্দ্রে রূপান্তরিত করা যাবে। সমাজ পরিবর্তনে মসজিদগুলো জীবন্ত ভূমিকা রাখতে পারবে।' আসলে জামাত মসজিদের কাজে এগিয়ে এসে ভালো মুসল্লি সেজে কু-কৌশলে মসজিদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব। এরা মসজিদের ব্যবস্থাপনা পরিষদ বা পরিচালনা কমিটি দখল করে শক্ত নিয়ন্ত্রণবাদ মসজিদে চালু করতে চায়। এরা বলছে— 'মসজিদগুলো সমাজ পরিবর্তনে জীবন্ত ভূমিকা' রাখবে। মসজিদ সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখতে পারে কিন্তু জামাত নিয়ন্ত্রিত মসজিদ দ্বারা সেই ধরনের সমাজ পরিবর্তন হবে; যে সমাজে রগকাটা হবে, একদেশদর্শী ফতোয়া চলবে, মুক্তিযুদ্ধের সময়কালের মত নারী-ধর্ষণ, মা-বোনের ইজ্জত লুণ্ঠনের মত দজ্জাল সৃষ্টি হবে, ইসলামের নামে ইসলাম-বিরোধী মওদুদীবাদের আধিপত্যে যাবতীয় কল্যাণধর্মী-মানবিকতা বিনষ্ট হয়ে পড়বে। এক ভয়াবহ অবস্থার মুখোমুখি হবে মানব সন্তান।

জামাত প্রকাশ্যে জনসভা বা অন্যান্য ভূমিকা রাখতে পারে না বলে অনেক গ্রামে, অনেক শহরে, অনেক প্রতিষ্ঠানের মসজিদে ঢুকে পড়ে অবস্থান তৈরি করে বৈরী-বাতাসে নিঃশ্বাস নিয়ে বাঁচতে চায়। মসজিদে অবস্থান করে তারা বিভ্রান্তির-ধূম্রজালে সাধারণ-মানুষকে ধোঁকা দিয়ে বোকা বানিয়ে আটকাতে তৎপর; এই তৎপরতা জরুরিভাবে মোকাবেলা করা উচিত।

আমরা লক্ষ্য করছি যে, ঢাকায় জামাতের রাজপথজনিত উৎপাত আর সন্ত্রাসী-আক্রমণ পবিত্র বায়তুল মোকাররম মসজিদ সংলগ্ন উত্তর-এলাকা থেকেই সৃষ্টি হয়, এই অনাসৃষ্টি কেন মসজিদের ছায়া থেকে প্রকাশ্যে লক্ষ্য করবো? অনেকের অভিযোগ মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী হায়েনা এই জামাতই একমাত্র বায়তুল মোকাররম মসজিদের এলাকা ব্যবহার করে থাকে, অন্যকোন রাজনৈতিক দল তা করে না। অন্যকোন দলে কি মুসলমান নেই? সব মুসলমান-তো জামাত করে না, জামাত করে মুষ্টিমেয় বেতনভুক্ত ও বিভিন্ন অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধেপ্রাপ্ত ও বিভ্রান্ত লোকজন; যারা মসজিদ বা মসজিদের ছায়ায় নিজেদের নগ্ন-হিংস্র চেহারা ঢেকে রাখতে চায়। এ বিষয়ে মুসল্লিদের সচেতন হওয়া জরুরী এবং এদের হাত থেকে মসজিদ ও মসজিদের এলাকা বাঁচানো প্রয়োজন।

১৯৮৭-এর এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, বাংলাদেশে মসজিদের সংখ্যা প্রায় এক লাখ চুরাশি হাজারের মত। এ সংখ্যা এ ক'বছরে আরো বেড়েছে। এসব মসজিদ সমাজের প্রতিষ্ঠান হিসেবে দীর্ঘদিন আগে থেকে গড়ে উঠেছে। প্রাচীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে মসজিদের ভূমিকা এ সমাজে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। জামাত এ কারণে মসজিদকে তাদের টার্গেটের আওতায় এনে ব্যবহার করতে উদ্যোগী হয়েছে। এদের হাত থেকে মসজিদ উদ্ধার করা জরুরি হয়ে পড়েছে। এজন্য সকলকে সম্মিলিতভাবে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। বেশ কিছুদিন আগে সংগ্রামী-ছাত্ররা মসজিদকে জামাতিদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নগরে প্রচারণামূলক কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। এ কর্মসূচী নগণ্য হলেও কিছুটা লক্ষ্যমুখী ছিল। আজ এ ধরনের কর্মসূচী ব্যাপক হওয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অন্যান্য পদক্ষেপ ও সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী জরুরী। শুধুমাত্র রাজপথে মিছিল আর বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি দিয়ে জামাতকে রোখা যাবে না। আধুনিক সাংগঠনিক ভূমিকা ও কৌশলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে জামাতকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে জামাতের শক্তিশালী মসজিদ টার্গেটের স্বপ্ন-সাধ ব্যর্থ করে দিতে হবে। ❑

৪ শ্রাবণ ১৪০১
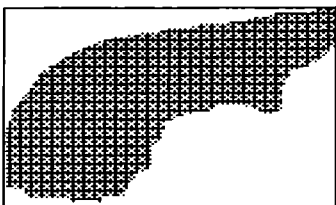
জামাত নাকি নবীগণের কাজ করছে!

জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ নামক সংস্থাটি এদেশের রাজনৈতিক পরিবেশের সুযোগ-সুবিধে গ্রহণ করে ধর্মের নামে মানুষের কাছে নিজেদেরকে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে সাংগঠনিক অপতৎপরতা চালাচ্ছে। বিভ্রান্তি আর অসত্যের জটাজলে এদেশের রাজনৈতিক-ধারাকে সুস্থতার বদলে অসুস্থ বা বিপদাপন্ন করে তুলছে। এদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে দিয়ে বাতিল আগাছা হিসেবে তারা চিহ্নিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শহীদদের আত্মত্যাগ আর রক্তের মধ্যে দিয়ে পরাজিত হয়ে তারা এক ঘৃণ্য শক্তি হিসাবে ইতিহাসে জায়গা দখল করে নিয়েছে। সেই কালজ্ঞ-শক্তি আজ যেন গুহা থেকে বের হয়ে একমাত্র ধর্মের আলখেল্লা পরে দিনের আলোয় এসে মাটি পেয়ে ঘাঁটি তৈরি করে আজ দাঁড়াতে চাচ্ছে। তাদের বাঁকা -শিরদাঁড়া একমাত্র ধর্মের ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সোজা করতে চাইছে। আর সে কারণে ধর্মকে তারা ইচ্ছেমত ব্যবহার করতে করতে ধর্মকে হেলা-ফেলায় নিয়ে যাচ্ছে!

জামাত তাদের 'ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই' এ অত্যন্ত হীন-কৌশলে আর নিজেদের হীনস্বার্থে ধর্মকেই শুধু ব্যবহার করে নি, নবীদেরও ব্যবহার করেছে। উল্লিখিত বইয়ে উল্লেখ করা হয়েছে 'যে কাজ করার জন্য আল্লাহর নবীগণ দুনিয়ায় এসেছেন জামায়াতও সেই কাজই করছে।' হতবাক হতে হয়, আশ্চর্য হতে হয়! নবীগণ যে কাজ করার জন্য এসেছেন, সেই কাজ কি জামাত করছে, না করেছে? কখনো না। তারা নবীদের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে নবীদের মর্যাদাকেই খাটো করেছে। নবীরা তাঁদের কাজের মধ্যে কখনো খুন, ধর্ষণ ও নিজেদের ভাই-ভগ্নীদের মধ্যে বিভেদ টেনে এনে নির্যাতন করার উদ্যোগ সমর্থন করেন নি; জামাত মুক্তিযুদ্ধে খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণ ইত্যাদি অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকে ইতিহাসে মনুষ্য-প্রাণীর নিম্নতম যোগ্যতার প্রমাণ রাখে নি বরং ইতিহাসের ঘৃণ্য-অপশক্তি হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করেছে, সেই জামাতের কাজ কিভাবে নবীদের কাজের সঙ্গে তুলনীয় হয়? সামান্য যুক্তিবোধ যদি থাকে, তবে তা বিবেচনায় এনে বলা যায় যে, জামাত নবীগণের মর্যাদাকে হীনস্বার্থে অপব্যবহার করে নবীগণের মর্যাদাকে দারুণভাবে ক্ষুণ্ন করেছে। সীমাবদ্ধ ও ছোট করেছে।

নবীগণ পৃথিবীতে এসে কি করেছেন? নিশ্চয় কল্যাণকর ভূমিকা রেখেছেন।

মানবজাতির মধ্যে যে অন্যায়- অবিচার বিরাজ করেছে, সেসব দূর করার জন্যে তাঁরা উদ্যোগী হয়েছেন। শান্তি আর মানুষের জন্য ত্যাগ করেছেন। আর জামাত নবীগণের নামে তথাকথিত পথ অনুসরণ করে কোন কল্যাণকর-মানবতাবাদী দৃষ্টান্ত এদেশে কখনো রেখেছে? না, কখনো না। এখন তারা খুন-জখম করে রগ কেটে মানুষের কাছে এক ধরনের ফ্যাসিস্ট-সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয়কে তুলে ধরেছে। তারা নবীগণের নিম্নতম মানবিক গুণের অধিকারী নয় অথচ তারা নবীগণের অনুসারী হিসেবে নিজেদের ভাবছে! অন্যান্য নবীদের কথা বাদ দিয়ে শুধু হযরত মোহাম্মদ (সঃ)-এর কথাই যদি বলি, তবে কি বলা যায় নাঃ এদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে শেষ নবীর কোন বৈশিষ্ট্যের ছিটেফোঁটা যদি থাকতো, তবে জামাত একাত্তরে হিংস্র-হায়েনাদের সহযোগী হয়ে কখনো একই ধর্মের ভাই-বোনদের খুন-ধর্ষণ করার ব্যাপারে উৎসাহী হত না। জামাতের ছত্র-ছায়ায় যেসব আলবদর রাজাকার ছিল, তারা ছিল সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, তাদের বিপরীতে ছিল হাজার হাজার লক্ষ গুণ বেশি মানুষ, যারা নবীগণের উত্তরাধিকার হিসেবে ঐক্যে, দৃঢ়তায় ও মানবিক-উজ্জ্বলতায় মুক্তিযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ন্যায্য অধিকার ও মানবতা রক্ষায় তাঁরা সেদিন ধর্মকে খাটো করে নি, নবীদের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে নি। সেদিন যারা এর বিপরীতে দাঁড়িয়ে ছিল, আজ সেই চিহ্নিত মহল চাতুর্যের সাথে ধর্ম ও নবীগণের মর্যাদাকে ব্যবহার করছে। জামায়াত 'ব্যক্তিগত রিপোর্ট' বইয়ে আরো উল্লেখ করেছেঃ 'সম্মুখে অগ্রসর হবার পর পেছনে ফিরে যাবার সকল পথ বন্ধ করে দিন। একথা ভাল করে বুঝে সুঝে অগ্রসর হবেন যে, পেছনে ফিরে যাবার কোনই পথ নেই। আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে আপনার জান-মালকে তাঁর হাতে বিক্রি করে দেবার পর তা কিছুতেই আর ফেরত নিতে পারেন না। এ প্রতিশ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে আপনি এক জীবন-পণ সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে গেছেন। এ পথে আপনাকে চলতে হবে, অপরকে চালাতে হবে।' এ বক্তব্যে লক্ষ্য করা যায় যে, জামাতের পুরনো ইতিহাস, অপকর্ম সম্পর্কে কেউ যেন প্রশ্ন তুলতে না পারেন, জামাতের কোন বিভ্রান্ত কর্মী যেন পিছনের দৃশ্য বা ছবির মাধ্যমে আসল চেহারা না ধরতে পারে। এভাবে হীন-কৌশলে কায়েমী স্বার্থে মানুষদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। আর এমনভাবে সমার্থক করে বলা হচ্ছেঃ জামাতের সঙ্গে সম্পর্কিত হলে আল্লাহর সাথে প্রতিশ্রুতিতে সম্পর্কিত হওয়া যায়। আল্লাহ, ধর্ম, নবীগণের সাথে ভয়াবহভাবে তাদের সামঞ্জস্য তৈরি করে কৃত্রিম এক আবহ জামাত 'ব্যক্তিগত রিপোর্ট বই' এ সৃষ্টি করেছে।

উল্লিখিত বইয়ে আরো বলা হয়েছে ঃ 'এ জামায়াতে শামিল হবার সময় স্বেচ্ছায় ও সজ্ঞানে সেই প্রতিশ্রুতিই গ্রহণ করা হয় যাকে আল্লাহতায়ালা বিক্রি চুক্তি

বলে আখ্যায়িত করেছেন। গঠনতন্ত্রের মধ্যে জামায়াতে ইসলামীর যে লক্ষ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ আস্থা রেখে যিনি জামায়াতে শামিল হবার সময় আল্লাহপাকের সাথে বিক্রি চুক্তি সম্পাদন করেন তার দৃষ্টিতে এ চুক্তি কখনোই এমন কোন জামা-কাপড়ের মত হতে পারে না যাকে যখন ইচ্ছা পরা যায় আবার যখন ইচ্ছা খুলে রেখে দেয়া যায়।' এমনভাবে এসব কথা বলা হয়েছে যে, জামায়াতে শামিল হওয়া মানে আল্লাহর পথে পা রাখা, আল্লাহর সাথে 'বিক্রি চুক্তি' সম্পাদন করা হয়ে থাকে। এভাবে কায়েমী স্বার্থে ও সংকীর্ণ-দৃষ্টিতে মানুষকে বিভ্রান্ত করে জামাতের ছত্র-ছায়ায় অনেককে টানতে তারা কসুর করছে না। অথচ এই জামাত বিভ্রান্ত-পথের যাত্রী, মওদুদীবাদের মাধ্যমে ইসলাম ও পবিত্র ধর্মগ্রন্থকে বিকৃত করার অভিযোগে অভিযুক্ত আসামী। এই আসামীদের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে উৎসারিত অনেক অভিযোগও রয়েছে। মানবতা-বিরোধী, ধর্ম-বিরোধী এই অপশক্তি রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের ও রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধে পেয়ে পরিকল্পিতভাবে ধর্ম ও নবীগণের মর্যাদাকে আজ বিভ্রান্তির ঘোলা-জলে টেনে নিয়ে ব্যবহার করে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

জামাত আজ পবিত্র কোরআন-হাদীস, ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের একমাত্র সোল-এজেন্ট হিসাবে নিজেদের জাহির করছে। এবং এদেশের নতুন প্রজন্মের অনেক তরুণ আর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজনকে বিভ্রান্তির কূটজালে আটকানোর অপপ্রয়াস পাচ্ছে। গা ছেড়ে দিয়ে ইচ্ছে মত ধর্মকে, নবীদের যেভাবে ব্যবহার করছে তা যুক্তির বাইরে এবং তাদের ভূমিকা-নির্ভর বিবেচনায় এভাবে এসবের ব্যবহার ধৃষ্টতাপূর্ণ ও অগ্রহণযোগ্য। তাই তা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। তারা মুক্তিযুদ্ধে যেভাবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছে, ঠিক তেমনি আজ আরো বহু কারণে শাস্তিযোগ্য অপরাধে অপরাধী হয়ে পড়েছে।

জামাতের ইন্দ্রজাল থেকে আল্লাহ, নবী, কোরান, হাদীস, মুক্তিযুদ্ধ ও মানবতার মর্যাদাকে রক্ষা করে কল্যাণের পথকে প্রশস্ত করা জরুরি কর্তব্য বলে মনে করি। অকল্যাণের প্রতিভূ, প্রতীক, সংস্থা ও অপশক্তির আঁধার হিসাবে জামাত চিহ্নিত হয়ে আছে, সেই চিহ্ন মুছে না ফেলতে পারলে ভ্রষ্ট হবে মানুষ, নষ্ট হবে অনেক কিছু। এটাই হবে ট্রাজেডি! ❑

১৬ ভাদ্র ১৪০১

জামাত আজ হিংস্র-ছোবলে আর নীল-নকশায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান দখলের রাজনীতি করছে। তারা তাদের মধ্যযুগীয় ও নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর জগদ্দল-পাথর ছাত্রদের ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে। অবুঝ-সবুজ শিশুদের টার্গেট করে দুঃখজনকভাবে দলীয় একদেশদর্শী-বিকৃত-কুদর্শন দিয়ে তাদের প্রভাবিত করছে। জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গী ও জাতীয় পাঠ্যক্রমের বাইরে তারা মনগড়া পাঠ্যক্রমের মাধ্যমে ছাত্রদের কু-শিক্ষা দিচ্ছে। এই অবস্থা প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সবার বিশেষ বিবেচনা জরুরী হয়ে পড়েছে।

এই দুর্ভাগা দেশে শিক্ষা এখনো বিশেষভাবে উন্নত পর্যায়ের মান স্পর্শ করতে পারে নি, বিস্তৃতভাবে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আওতায় নিয়ে এসে শিক্ষা দেয়া সম্ভব হয়ে ওঠে নি। এজন্যে শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার কথা বিবেচনায় আনার পাশাপাশি আজ আৎকে উঠতে হচ্ছে যে, জামাত প্রচলিত শিক্ষার বিরুদ্ধে নিজেদের দলীয় অভিসন্ধিতে ভরা তথাকথিত শিক্ষার নামে কালো হাত প্রসারিত করছে।

জামাত তাদের 'সংগঠন পদ্ধতি' নামক পুস্তকে উল্লেখ করেছেঃ 'শিশু ও বয়স্কসহ সর্বস্তরের জনগণকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা আমাদের দেশে খুবই কম। যা আছে আদর্শের দৃষ্টিকোণ থেকে তা খুবই দুর্বল ও বিকৃত। একারণে সংগঠনকে দ্বিমুখী তৎপরতা চালাতে হবে। (ক) প্রতিটি মক্তব, মাদ্রাসা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, স্কুল ইত্যাদিতে নিজস্ব প্রভাব সৃষ্টি করতে হবে। (খ) নিজেদের উদ্যোগে মক্তব, মাদ্রাসা, বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, কিন্ডার গার্টেন ইত্যাদি চালু করার পদক্ষেপ নিতে হবে।' জামাত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে, তা তাদের উল্লিখিত দলিলে লক্ষ্য করা যায়। আধুনিক সমাজ গঠনে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী, সে কারণে জামাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রভাব বাড়ানোর হীন-কৌশল গ্রহণ করেছে।

পত্রিকায় আমরা লক্ষ্য করলাম যে, চট্টগ্রাম শহরের প্রাণকেন্দ্রে সরকারী প্রাথমিক ও উচ্চবিদ্যালয়ের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখা হচ্ছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ-বিরোধী ফ্যাসিস্ট জামাত-শিবির বিভিন্ন বই-পুস্তক বিতরণ করছে, যেসব বই জাতীয় পাঠ্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্য নয়। এমনকি স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন প্রতিযোগিতার উপহার হিসেবে আবু

আলা মওদুদীর জামাতী জীবনের আত্মশুদ্ধি, গোলাম আযমের প্রশ্ন-উত্তরের আসর, মতিউর রহমান নিযামীর দ্বীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব এবং ইসলামী আন্দোলন ও সংগঠন নামের বইসমূহ দেয়া হয়েছে। যেন-তেন প্রকারে শিশু-কিশোরদের ওপর প্রভাব বিস্তার করার জন্য জামাত কাজ করছে।

শুধু চট্টগ্রামে নয়, এই ঢাকা নগরের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জামাতের প্রভাব বাড়ানোর জন্য বিভিন্ন অপ-কৌশল নেয়া হয়েছে। এ নগরে শিশু-কিশোরদের জন্য এলাকায় এলাকায় অগণিত কিন্ডার গার্টেন আর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বেসরকারীভাবে গড়ে উঠেছে। এসব প্রতিষ্ঠানে সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা সরকারী গাইড-লাইন অনেক ক্ষেত্রে কার্যকর নয়, যার ফলে জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম বা নীতিমালাকে এইসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখাচ্ছে। এসব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা খেয়াল-খুশীর আওতায় পতিত হচ্ছে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, এসব প্রতিষ্ঠানের গ্রাসে ঢাকা নগরবাসী অভিভাবকরা অসহায় হয়ে পড়েছে। ভেঙে পড়ছে প্রচলিত শিক্ষা কাঠামো। শুধু ঢাকা নগর নয়, দেশের অন্যান্য শহরেও এ অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তারমধ্যে জামাতের উৎপাততো রয়েছেই।

জামাতের তত্ত্বাবধানে ইতোমধ্যে ঢাকা নগরসহ বিভিন্ন শহরে অনেক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও কিন্ডার গার্টেন গড়ে উঠেছে। এসব কালজ্ঞ প্রতিষ্ঠানের ছোবলে আগামী-প্রজন্ম বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ছে; সেই ব্যথা অবুঝ শিশু- কিশোররা বুঝতে পারছে না। অভিভাবক হিসেবে তা আমাদের অনুভব করতে হবে। এসব জামাত নিয়ন্ত্রিত স্কুল-কিন্ডার গার্টেনে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পড়ানো হয় না। জাতীয় পতাকার কি রঙ তা জানানো হয় না, কোমলমতি শিশুদের নিকট জাতীয় সঙ্গীত অচেনা আর অজানা সুর হিসেবে থেকে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর নাম উচ্চারণ করা হয় না, হলেও বিকৃতভাবে হয়। বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাস ও সংস্কৃতির রূপ এসব স্কুলের কৃত্রিম পাঠ্যসূচী দিয়ে ঢেকে রাখা হচ্ছে। এসব স্কুল-কিন্ডার গার্টেনকে আজ চিহ্নিত করা প্রয়োজন এবং এ বিষয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো ও প্রতিরোধ গড়ে তোলা দরকার। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আর কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষার্থীদেরকে জামাতের ভবিষ্যত 'ক্যাডার' হিসেবে গড়ে তোলার অপপ্রয়াস নেয়া হয়েছে। আর আমাদের নিরীহ সন্তানেরা এই মওদুদীবাদী ফ্যাসিস্ট দলের রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কৌশলের ফাঁদে ধরা দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এখনো সময় আছে, আমাদের নতুন প্রজন্মকে জামাতের হাত থেকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা গ্রহণ করতে হবে, নইলে যে সর্বনাশ হচ্ছে, তা আরও বহুগুণে বেড়ে যাবে। জামাত তাদের দলিলে উল্লেখ করেছে যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাদের প্রভাব বাড়াতে হবে। রাজশাহী ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রভাব বাড়ানোর জন্য তারা সশস্ত্র হামলা, খুন-জখম করেই ক্ষান্ত হয় নি; এসব প্রতিষ্ঠানে দখল নেয়ার

জন্য টাকা-পয়সাও খরচ করছে। এক্ষেত্রে বিদেশী টাকা ও বিভিন্ন সংস্থার সাহায্যও রয়েছে বলে অভিযোগে প্রকাশ।

ঢাকা নগরে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কিন্ডার গার্টেন জামাতের নিয়ন্ত্রণে সেগুলো অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে পরিচালিত হয়ে থাকে। শিক্ষক থেকে শুরু করে পিওন- দারোয়ান সবাই জামাতের বেতনভোগী কর্মী। জামাতের এসব গজিয়ে ওঠা স্কুল-প্রতিষ্ঠানের উৎসমুখ সম্বন্ধে যদি আমরা সবাই সচেতন না হই বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি এ বিষয়ে সচেতন হয়ে প্রতিরোধমুখী পথ না গ্রহণ করতে পারে, তবে তা হবে বেদনাদায়ক।

জামাত শুধু উল্লিখিত স্কুল-কিন্ডার গার্টেন পরিচালনা করে ক্ষান্ত হয় নি, এই ঢাকা নগরের বিভিন্ন কিন্ডার গার্টেনের পাঠ্যসূচীতে তাদের বই-পুস্তক অন্তর্ভুক্ত করেছে। এসব কিন্ডার গার্টেনের অভিভাবকরা সচেতনভাবে লক্ষ্য করলে তা চিহ্নিত করতে পারেন। ঢাকা নগরের কিন্ডার গার্টেনসমূহে জাতীয় পাঠ্যক্রম অনুসরণ করার জন্য কঠোর আইন প্রবর্তন করা প্রয়োজন। কেননা এই ঢাকা নগরে লক্ষ লক্ষ শিশু-কিশোর কিন্ডার গার্টেনের শিক্ষায় বাধ্য হয়ে পড়ালেখা করছে। আর সেই কিন্ডার গার্টেন আবার জামাতের হিংস্র-ছোবলে আক্রান্ত। এ বিষয়ে সরকার কেন নিশ্চুপ! একটি স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার শত্রুদের দ্বারা শিক্ষা-ধারা বিপদাপন্ন হবে, তা বিবেকবান মানুষ মাত্রই পছন্দ করতে পারেন না। কেন বা এসব শক্তি সরকারী বা জাতীয় পাঠ্যক্রমের বাইরে রাজনৈতিক দলীয় হীন-স্বার্থে পাঠক্রম চালু করে দিব্যি যা ইচ্ছে করার স্পর্ধা রাখবে? এ বিষয়ে কি সরকারী শিক্ষা বিভাগের কোন দায়-দায়িত্ব নেই? নাকি সরকার জামাতের সহযোগী হিসেবে কাজ করছে?

আশ্চর্য হতে হয়, শুধু জামাত নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত অবহেলিত নয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়েও জাতীয় সঙ্গীত মর্যাদা পায় না। এসব প্রতিষ্ঠানে জামাতের লোকজন দখল নিয়েছে বলেই মনে হয়। এবং আমরা এসব জাতীয় প্রতিষ্ঠানে যেসব লোকের চেহারা দেখছি, তাতে সে সন্দেহ আরো পরিষ্কার হচ্ছে।

জামাত বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর বিভিন্ন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন অপকৌশল গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে যে শিক্ষা মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে, সেই সুস্থ শিক্ষা-ধারার বিপরীতে ফ্যাসিস্ট মনোভাবের মধ্যযুগীয় হিংস্র-দৃষ্টিভঙ্গি-নির্ভর- মওদুদীবাদপূর্ণ শিক্ষা নামীয় অপধারা প্রবর্তন করার জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দখল নিচ্ছে। এই দখলের বিরুদ্ধে সবার সোচ্চার হবার সময় এসেছে। ❑

১৯ শ্রাবণ ১৪০১
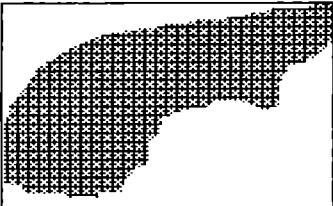
তথাকথিত নতুন কাণ্ডারিদের চেহারা ও পোশাক

ইসলামের আবরণকে নিজের পোশাক ভেবে যারা ভাবছেন যে, তাদের চেহারা কেউ আগে দেখে নি বা তাদের চেহারা সম্পর্কে কেউ জানে না, তবে তা ভুল হবে। চেহারায় যে কদর্য আর দুর্গন্ধ রয়েছে, তা এমন; সুগন্ধী দিয়েও দূর করা সম্ভব নয়। এমন কিছু চিহ্নিত লোকই আজ রাজপথে নেমে হইচই আর ইসলামের গুণগানে দিশেহারা হয়ে পড়েছে। এদের উদ্দেশ্যটা কি? এরা কি চায়? এরা কি আসলেই ইসলামের দরদী? এ ধরনের প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক।

ইসলামতো দূরের কথা, যে কোন মানবিক বৈশিষ্ট্য বা নৈতিকতা এরা ধারণ করে না। ধারণ করে না–মানুষের কোন কল্যাণ, ধারণ করে না–দেশের মূল্যবোধ, ধারণ করে না– সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী, ধারণ করে না– স্বচ্ছ কোন চেতনা। এরাই আজ ইসলামের পতাকাবাহী হয়ে পথে নামছে। দুঃখজনক পরিণতির মুখোমুখি হয়ে দেশের মানুষকে আজ ঐসব চিহ্নিত-লোককে অবলোকন করতে হচ্ছে।

"সাত খুনের মূল নায়ক শফিউল আলম প্রধান, নিজ কন্যা কর্তৃক ধিকৃত চরিত্রহীন আনোয়ার জাহিদ ও ১৫ আগস্ট হত্যাকাণ্ডের নায়ক মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা'র মত সমাজ বিরোধী ঘৃণিত ব্যক্তিদের দিয়ে কি ইসলামী আন্দোলন সম্ভব?" বায়তুল মোকাররম মসজিদের খতিব ওবায়দুল হককে লিখিত এক খোলা চিঠিতে এ প্রশ্ন করেছেন ইসলামী বিপ্লবী আন্দোলনের মহাসচিব হাফেজ মওলানা জিয়াউল হাসান। এ ধরনের জিজ্ঞাসা শুধু মওলানা জিয়াউল হাসানের নয়, অনেকের।

ব্যক্তি কুৎসা রটনার উদ্দেশ্যে এ ধরনের প্রশ্ন জিয়াউল হাসান তোলেন নি বরং নৈতিক-বিবেচনায় বিবেক- তাড়িত হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। ইতিহাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে যদি উল্লিখিত ব্যক্তিদের শ্রেণী-চরিত্র বিবেচনায় টেনে আনি, তবে আমরা হতবাক হই, এসব খুনী ও বিকৃত লোকেরা আজ রাজনৈতিক অঙ্গন দখল করছে, গণতন্ত্রের তথাকথিত সুযোগ নিয়ে। এরাই যদি রাজনৈতিক পোশাক পরে ইসলামী জোস নিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করে, তবে রাজনীতিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়, কোথায় নিয়ে যাওয়া হয় ইসলামকে!

ইসলামের তথাকথিত কাণ্ডারি হিসেবে শফিউল আলম প্রধান আজ নতুনভাবে নিজেকে পরিচিত করে তুলছেন যার পরিচিতি বা বায়োডাটায় আমরা লক্ষ্য করছি যে, এই ভদ্রলোক '৭৪ এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৭ জন তরুণকে খুন করে 'সাত খুনের আসামী' হিসেবে পরিচিতি লাভ করতে উদ্যোগী হয়। সেই খুনীর পরিচিতি ছাড়িয়ে নিজকে ইসলামের তথাকথিত খাদেম হিসেবে উৎসর্গ করতে আজ তিনি বড়ই উদগ্রীব। মওলানা জিয়াউল হাসান বিবৃতিতে আরও উল্লেখ করেছেন যে, শফিউল আলম প্রধান বায়তুল মোকাররমের সোনার দোকান ডাকাতির আসামীও ছিল। সেই প্রধান আজ একজন প্রধান 'মৌলবাদী' হিসেবে নিজকে পরিচয় দিচ্ছে এবং এরা বলছে যে, 'যে মৌলবাদী নয় সে জারজ মুসলমান'। খুনীরাই আজ সার্টিফিকেট দিচ্ছে! এ অবস্থার মুখোমুখি হয়ে আমরা দিন কাটাচ্ছি, রাত কাটাচ্ছি। আর রাষ্ট্রীয় সুযোগ, গণতন্ত্রের তথাকথিত স্বাধীনতা নিয়ে এইসব খুনীরা মানুষকে যা ইচ্ছে গালি দিয়ে নিজেদের পুরনো চেহারাকে আড়াল করতে চায়। এক ভদ্রলোক তো জারজ মুসলমান এ ধরনের উক্তি শুনে মামলা দায়ের করেছেন, এবং সেই ভদ্রলোকের ব্লাড প্রেসারও বেড়েছে বলে পত্রিকায় খবর বেরিয়েছে। আসলে এ ধরনের লাগাম ছাড়া কথা শুনে কার না চিত্ত চঞ্চল হয়ে ওঠে? কার না মনে প্রতিক্রিয়া হয়? আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অসৎ খুনী আর সুবিধেবাদী লোকদের হাতে রাজনীতি কখনো কখনো জিম্মায় পড়ে কাতরায়, সেই কাতরানোর সাথে সাথে ইসলামকেও কু-মতলবে ব্যবহার করে ছোট করা হয়ে থাকে।

১৫ আগস্টে বঙ্গবন্ধুকে সাম্রাজ্যবাদী ও মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি প্রসাদ ষড়যন্ত্রের মধ্যে দিয়ে হত্যা করে। হত্যার স্বপক্ষে যদিও খুনীরা অন্য অপযুক্তি দেখিয়ে খুন করাকে জায়েজ করতে চায়, তা এদেশের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয় নি। তবে বঙ্গবন্ধু শুধু একজন সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না, সাধারণ মানুষের সম্মিলিত শক্তি, স্বপ্ন ও মুক্তিযুদ্ধের উৎসধারার মূল-পুরুষ ছিলেন; সে কারণে তাঁকে হত্যার মধ্যে দিয়ে বাঙালির বহু কিছুকে হত্যা করে উল্টোপথে যাত্রা শুরু করার উদ্যোগ নেয়া হয়। সাম্রাজ্যবাদী, প্রতিক্রিয়াশীল ও মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত অপশক্তির লোকেরাই বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সুযোগ-সুবিধে নিয়ে এই দেশে তাদের ভিত্তিভূমি তৈরি করে। সেই ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর হত্যাকারী হিসেবে পরিচিত মেজর (অবঃ) বজলুল হুদা আজ ইসলামের তথাকথিত আর এক কাণ্ডারি হিসেবে নিজেকে জাহির করছে। মানুষ বিভিন্ন পোশাকপরা এসব লোকের আসল চেহারা চিহ্নিত করতে পারছে বলেই তারা নিজদের শুধু পুরনো পাপ আর জঘন্য

চেহারাকে শেষবারের মত ঢাকার জন্য ইসলামের নামে তথাকথিত আলখাল্লা পরে আজ মানুষের সামনে দাঁড়াতে চায়, কিন্তু এসব ধিকৃত খুনীদের কেউ কি পবিত্র ইসলামের পোশাকে দেখতে চাইবে? কখনো না। ইসলামের আলোকে এরা মানবের শত্রু হিসেবেই প্রাথমিক ও প্রধানভাবে বিবেচিত হবে। মানুষকে বোকা ভেবে ধোঁকা দিয়ে এরা কি নিজদের বাঁচাতে পারবে?

জামাতের গোলাম আযমদের সবই চিহ্নিত করতে পারে, এদের সাথে আরো কিছু নতুন তথাকথিত কাণ্ডারি এসে সংহতি প্রকাশ করছে, যারা গোলাম আযমদের মতই মুক্তিযুদ্ধের সময় হত্যাকারীর ভূমিকা পালন করেছে যেমন মুসলিম লীগের আয়েন উদ্দিন। তবে আরো কিছু তথাকথিত কাণ্ডারি অপরিচিত মনে হলেও খুনীদের দোসর বা পুরনো পাপী হিসেবে নিজকে লুকিয়ে রেখে ইসলামের নামে তথাকথিত পোশাকে সেজে আজ পথে নামছে। এদের একজন ইসলামী জেহাদের আহ্বায়ক মাওলানা বরকত উল্লাহ। ১৯৭১ সালের পর থেকে '৭৫ পর্যন্ত সে কারাগারে ছিল, যশোর আদালতে তার বিরুদ্ধে দালাল আইনে মামলাও ছিল। সেই মওলানা বরকত উল্লাহ বলেছে 'যেসব পত্র-পত্রিকা কোরআনের অবমাননা করেছে, সেই সব পত্রপত্রিকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে।' সে আরও বলেছে "শুধু তসলিমা নয়, ইসলাম এবং কোরআন বিরোধী সকল মুরতাদদের বিরুদ্ধেই সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।" ইসলামী জেহাদ নামের এই সংগঠনটির ঠিকানা বলা হয়েছে নয়ারহাট, সাভার। এদের অনেকে জামাত ও যুব কমান্ডের সাথে সম্পৃক্ত। জামাতের পৃষ্ঠপোষকতা এ সংগঠন পেয়ে থাকে বলে পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা গেছে।

গুহা থেকে বের হয়ে ইসলামের আলখাল্লা পরে মওলানা বরকতউল্লাহর মত লোকেরা সুযোগ পেলেই তারা প্রথমে পরাজয়ের গ্লানি মিটাতে হিংস্র যে হবে, তা বলা যায় নিঃসন্দেহে। ইতিহাসে লক্ষ্য করা যায়, পরাজিত শত্রুরা ক্ষমতায় এলে বা ক্ষমতা পেলে শত্রুতার পূর্ব রেকর্ড ভেঙ্গে হিংস্রতায় আরো নগ্ন হয়ে পশুত্ব অর্জনে বেশী তৎপর হয়। আর এই তৎপরতার আলামত হিসেবে লক্ষ্য করছি যে, এসব দজ্জালেরা বর্তমান সরকার, প্রতিষ্ঠান ও রাষ্ট্রের সুযোগ-সুবিধে নিয়ে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে প্রকাশ্যে লাঠি-অস্ত্র ব্যবহার করে সন্ত্রাসী পরিবেশ সৃষ্টি করছে, অথচ সন্ত্রাস দমন আইনে এদের ধরা হয় না। এরা প্রাইভেট রক্ষি-বাহিনী তৈরি করে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছে। খুন-জখম, হাত-কাটা-রগ কাটার মধ্যে দিয়ে এমন এক পরিবেশ সৃষ্টি করে এদের কেউ কেউ বলছে 'পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত

একদল গাদ্দার মিলে পাকিস্তান ভেঙ্গেছে।' মুক্তিযুদ্ধে লক্ষ লক্ষ লোক প্রাণ দিল, মা বোন ইজ্জত দিল, যুদ্ধ করলো, এরা সবাই হল এদের অন্ধ চোখের দৃষ্টিতে 'গাদ্দার'।

অন্ধ-চোখওয়ালা-হিংস্র চিহ্নিত পশুদের সাথে আরো কিছু নতুন পশু যোগ হয়ে—ইসলামের নামে তথাকথিত কাণ্ডারির পোশাক পরে মানুষ সাজতে চাচ্ছে, তা মানুষের বিবেক-তাড়িত বিবেচনায় সম্ভব হয়ে উঠতে পারে না। পশুদের গা থেকে ইসলামের নামে তথাকথিত পোশাক আসুন আমরা খুলে ফেলি, এসব পশুদের গায়ে মানবিক বা ধর্মের কোন পোশাকই শোভা পায় না। ❑

৬ ভাদ্র ১৪০১
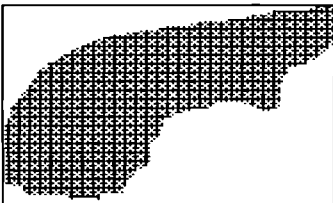
বিকৃত খবরের দৈনিক ও চিহ্নিত মহলের হইচই

দু' একটি দৈনিক মনের মাধুরী মিশিয়ে, না—মনের মাধুরী নয়; মনের কালিমা মিশিয়ে যেভাবে তথ্য বিকৃত করে খবর ছাপতে শুরু করেছে, তা সচেতন পাঠক মাত্রই অনুভব বা বিবেচনা করতে পারছেন। এভাবে খবরের জন্ম দিলে সেই খবর আসলে কি 'খবর'-এর পরিচয় নিয়ে বাঁচতে পারে? পারে না বলেই এসব খবর-এর মৃত্যু ঘটে থাকে; তথাকথিত খবর ছাপার পর পরই। খবরের উৎস যে ব্যক্তি বা দল বা প্রতিষ্ঠান, তাদের পাল্টা জবাব আমরা দেখতে পাই; এইসব জবাবের মধ্যে দিয়েই এসব তথাকথিত খবরের মৃত্যু ঘটে; কেননা পাল্টা জবাবের বিরুদ্ধে উত্তর বা যুক্তি বা প্রমাণ পরবর্তীতে আমরা এসব পত্রিকায় লক্ষ্য করি না। এইসব তথাকথিত খবর প্রকাশের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই কিছু কিছু চিহ্নিত মহল চঞ্চলতা অনুভব করে গা নাড়াচাড়া দিয়ে পথে নামে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য উদ্দেশ্যমূলক বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এসব দেখে মনে হয়—এসব 'খবর' চিহ্নিত মহলের পথ না পাওয়া নড়বড়ে তেলহীন গাড়ির তেল-শক্তি হিসেবে কাজ দেয়; কেননা তাদের গাড়ির তেল-শক্তি হিসেবেই এসব তথাকথিত 'খবর' বানানো হয়, যা এসব গাড়ির একমাত্র পরিপূরক।

এসব তথাকথিত 'খবর' সত্য ভাষণে মূর্ত হয়ে ওঠে না; বিকৃতভাবে হীন-উদ্দেশ্য বিবৃত করা হয় মাত্র। সব চাইতে স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে এরা মনগড়া কাহিনী গড়ে তোলে, বক্তার বক্তৃতা-বক্তব্য বিকৃত করে, আজগুবি তথ্য এনে জুড়ে দেয় খবরের শরীরে। সাধারণভাবে 'খবর' তৈরির নিম্নতম নৈতিকতা, সততা, সত্যতা এরা মানে না, অথচ এদের দৃষ্টিভঙ্গিতে সব সময়ে ধর্মীয় নৈতিকতার কৃত্রিম লক্ষণ তৈরি হতে দেখা যায়। এরা এদেশের মীমাংসিত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয়কে টেনে এনে টানা-হেঁচড়া করে, ক্ষত-বিক্ষত করে এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যে অসততার ভিত্তিতে ও সাংবাদিকতার নিম্নতম নীতির বাইরে থেকে আঘাত হানতে পিছপা হয় না। এসব পত্রিকার চারিত্র্য উন্মোচনে আমাদের তৎপর হওয়া উচিত, না হলে সংবাদপত্রের মর্যাদা কমবে, সেই সাথে সাংবাদিকতার নৈতিকতাও গ্লানিযুক্ত হবে।

তথাকথিত 'খবর' প্রকাশে সবচাইতে যে দৈনিকটি পাঠককে বেশী বিভ্রান্ত করছে, সৎ সাংবাদিকতার ললাটে কালি লাগাচ্ছে, মিথ্যের বেসাতি করছে, সেই

তথাকথিত দৈনিকটি বর্তমান সরকার নিয়ন্ত্রিত বিজ্ঞাপন সবচাইতে বেশী পাচ্ছে। এরশাদের আমলেও এই দৈনিকটি সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে বেশি। সরকারী আনুকূল্য তার চাই, আর চাইতে যেয়ে যা যা করা দরকার, তাই করতে হীন-তৎপরতা দেখিয়েছে। তারা সরকারী অবস্থান শক্ত-ভিত্তির ওপর রেখেছে যেমনি, তেমনি সরকারের সঙ্গে সখ্য বজায় রেখে সরকার-বিরোধী শক্তিকে নাজেহাল করার জন্যও উৎসাহভরে বিভিন্নমুখী তথাকথিত 'খবর' সৃষ্টি করে সরকারী 'আস্থা' অর্জনে সফল হয়েছে। কিন্তু এ 'সফলতা' বিবেকতাড়িত সততার নিরিখে বিবেচিত হলে দেখা যাবে দৈনিকটি নিজের ব্যবসা ঠিক রাখার জন্যই শুধু নিম্নতম নৈতিকতাকেও গুরুত্ব দেয় নি বা দেয় না। এরশাদের আমলে এরশাদের পক্ষে আবার এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের নেত্রী খালেদা জিয়ার আমলে খালেদা জিয়ার পক্ষে —এ দেখে মনে হয়; 'বৃষ্টি যেদিক ছত্র সেদিক'।

এই দৈনিকটি এ সরকারের আমলে আরো নির্দিষ্টভাবে ভূমিকা রাখতে তৎপর হয়েছে। এই তৎপরতার আওতায় পড়েছে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ভূমিকা, মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চেতনার বিকাশ রুদ্ধ করা এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের ব্যক্তিদের চরিত্র হননে পদক্ষেপ গ্রহণ। এসব ভূমিকার কারণে কি আমরা সুস্পষ্টভাবে বলতে পারি না যে, এ দৈনিকটি মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে বলেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে: কেননা মুক্তিযুদ্ধ বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎস ধারা।

দৈনিকটি সবচাইতে বেশি সংবাদ বিকৃত করেছে, বেশি বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে—সচেতন পাঠক মাত্রই তা লক্ষ্য করে থাকবেন। আওয়ামী লীগের সভানেত্রী ও বিরোধী দলীয় নেত্রী চিকিৎসার মত একটি মানবিক কারণে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন আর তখনই এই একমাত্র পত্রিকাটি সাংবাদিকতার সমস্ত নিয়ম-নীতি-সততাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে রিপোর্ট করলো 'সিঙ্গাপুর ষড়যন্ত্র'। পরদিন অবশ্য এটা ভিত্তিহীন বলে দুঃখ প্রকাশ করলো পত্রিকাটি। এমন কি সরকারী দলের উপনেতা ডাঃ বদরুদ্দোজা চৌধুরীর একটি বক্তব্য বিকৃত করে ছাপিয়ে ছিল, কিন্তু অতিরিক্তভাবে হয়তো তোষামোদ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছিল পত্রিকাটি। ভেবেছিল পার পেয়ে যাবে কিন্তু সরকারী দলের উপনেতার নৈতিকতা ও সততা রয়েছে বলে—এর তীব্র নিন্দা তিনি করেছেন এবং বলেছেন, রিপোর্টটি কদর্য ও কুরুচিপূর্ণ ও মিথ্যাচার। এরকম বহু তথাকথিত খবর ছাপানোর রেকর্ড আর কোন পত্রিকা অর্জন করতে পারে নি। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক কবীর চৌধুরীর একটি বক্তৃতা বিকৃত করে পত্রিকাটি ছাপিয়েছিল, আশ্চর্য হতে হয় এত দৈনিক থাকতে এত সাংবাদিক থাকতে অন্য কোন পত্রিকায় যে বক্তব্য ছাপা হয় না, সেই বক্তব্য

কিভাবে সংগ্রহ করে এ পত্রিকায় ছাপা হয়ে যায়। ঠিক তেমনি ডঃ আহমদ শরীফের বক্তৃতাকে কেন্দ্র করে এই দৈনিক একটি 'খবর' ছাপিয়ে চিহ্নিত মহলের দ্বারা বেশ হইচই বাঁধতে সক্ষম হয়েছিল। ডঃ আহমদ শরীফ নিজেও অস্বীকার করেছিলেন এ সংবাদ মূল্যকে; ঠিক তেমনি অন্যান্য দৈনিকও এ ধরনের সংবাদ ভাষ্য না পেয়ে না ছাপিয়ে এটাই প্রমাণ করে দিয়েছিল পরোক্ষভাবে যে, ঐ দৈনিকটি এ ধরনের বিকৃত সংবাদ ছাপতেই একমাত্র পারদর্শী।

বর্তমানে এই দৈনিকসহ আরো দু'একটি মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দৈনিক একজন লেখিকার বক্তব্যকে পুঁজি করে পরিকল্পিত ভাবে স্বাধীনতা বিরোধী ও প্রতিক্রিয়াশীল চিহ্নিত-মহলকে মাঠে-পথে হইচই করবার সাহস আর উৎসাহ যুগিয়ে যাচ্ছে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে—সরকার এইসব শক্তির বিরুদ্ধে কোন রকম প্রতিরোধমুখী ভূমিকা পালন করবে না। এইসব চিহ্নিত শক্তি সংবাদপত্রে দিন-দুপুরে প্রকাশ্যে হামলা চালিয়েছে, এমনকি বইয়ের দোকান ভাংচুর করে পবিত্র কোরআন শরীফ ও ধর্মীয় গ্রন্থকে অবমাননা করেছে বলে পত্র-পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ বেরিয়েছে। তবুও সরকার এদের বিরুদ্ধে কোন শক্ত বা যথাযথ ভূমিকা পালন করে নি।

সচেতন মানুষ মাত্রই বুঝতে পারছে যে, এইসব ভাংচুর– হইচই রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিমূলক কর্মকাণ্ডেরই অংশ। মদদকারী শক্তি, প্রকাশ্য শক্তি ও পরোক্ষ শক্তি মিলে-মিশে দেশে রাজনৈতিক-সামাজিক অবস্থাকে ভিন্নখাতে নিয়ে যেতে চাচ্ছে। আর এরই অংশ হিসেবে দিন দিন এইসব চিহ্নিত শক্তির লোকেরা মামার বাড়ির আবদারের মত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্মুখ দৈনিক পত্রিকাসমূহ নিষিদ্ধ করারও শ্লোগান দিচ্ছে। পাশাপাশি এইসব সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে সরকারের বিজ্ঞাপন অস্ত্রও ব্যবহার হচ্ছে। দুই দিক থেকে এইসব পত্রিকার ওপর আক্রমণ দেখে যেন মনে হচ্ছে— আহা কি সাযুজ্য, আহা কি ঐক্য!

যারা মুক্তিযুদ্ধকে স্বীকার করে না, তারা এদেশের নাগরিক হতে পারে না এবং তাদের দ্বারা এদেশের সার্বভৌমত্ব নিরাপদ নয়। অথচ আমাদের ট্রাজেডি—বিভিন্ন সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ও দুর্বলতার কারণে এইসব মুক্তিযুদ্ধবিরোধী অপশক্তি আজ সমাজের বিভিন্ন স্তরে জায়গা নিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে আঘাত হানতে শুরু করেছে। পরাজিত শক্তি মাথা তুলে দাঁড় হতে পারলে নতুন কৌশলে নতুন শক্তির স্পর্ধায় ছোবল মারে; সে অভিজ্ঞতা আজ বাঙালি অনুভব করছে সহজেই। এ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে আমরা লক্ষ্য করছি— মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শক্তির হাতে এসে উপস্থিত হয়েছে গণমাধ্যম, দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িকীর মত অস্ত্র। এসব অস্ত্র যে আঘাত হানবে—তা স্বাভাবিক। মুক্তিযুদ্ধের সময় যেমন ইসলামের নামে, ইসলামের নিম্নতম নৈতিকতা ধারণ না করে পাশবিক উল্লাসে মানুষকে হত্যা

করেছে –নৈতিকতাহীন যে শত্রুরা; সেই শত্রুরা পত্রপত্রিকা হাতে পেয়ে কোন সুস্থ স্বাভাবিক ও মানবিক ভূমিকা পালন করবে না, সেটাই বাস্তব। এই অস্বাভাবিকতার মধ্যে দিয়ে আজ সাংবাদিকতার একটি ধারা চোরাস্রোতে এসে হাবু-ডুবু খাচ্ছে। শুধুমাত্র পেশাগতভাবে কোন সাংবাদিক এ বিষয়টি যদি মেনে নেন, তাহলে মহান মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাকে খাটো করা হবে। যেসব সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ দিয়েছেন, শহীদ হয়েছেন, তাদের প্রতিও অশ্রদ্ধা করা হবে।

বিকৃত খবর পরিবেশন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করা এবং তা দিয়ে ঘোলা- জলে মাছ শিকার করা যাদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে, তারা খুউব আয়েসে ঢেকুর তুলতে পারে, কিন্তু সবাই তা পারে না। আর সবাই তা পারে না বলেই আজ যূথবদ্ধ হয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী অনৈতিক, সাংবাদিকতার নিয়ম নীতি বিরোধী অসৎ শক্তির হাত থেকে সাংবাদিকতার প্রধান ও সুস্থ-ধারাকে রক্ষা করতে হবে। ❑

১ আষাঢ় ১৪০১

জামাতকে রুখে দাঁড়ানো ও গাইবান্ধার চিত্র

আন্তরিক অভিনন্দন জানাই— সাতক্ষীরা, চুয়াডাঙ্গা, গাইবান্ধা, রংপুরের জনগণকে; যারা সাহসী আর মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের চিরকালের শত্রু গোলাম আযম ও তার পদঅনুসরণকারী ইতিহাসের চিহ্নিত কালজ্ঞ— পশুদের রুখে দাঁড়িয়েছে সম্প্রতি। এই মনুষ্যরূপী পশুরা মাটি পেয়ে হিংস্রতার বহুমুখী থাবায় মুক্তিযুদ্ধের সকল অর্জন-স্পর্ধাকে শুধু হেয় করতে চাচ্ছে, না, তারা হিংস্রতার সর্বগ্রাসীরূপ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে পুরোপুরি গিলে খেতে উদ্যত! কিন্তু তা তারা পারছে না বলেই উল্লিখিত স্থানসমূহে প্রকাশ্যে প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে।

যতদিন স্বজন হারানোর ব্যথা- স্মৃতি আমরা ভুলবো না; যতদিন আমরা শহীদদের উত্তরাধিকারী হিসেবে গৌরববোধ করবো; যতদিন সেই নরঘাতক মনুষ্যরূপী পশুদের হিংস্রতার কালজ্ঞ- ইতিহাস জানবো; যতদিন আমাদের জাতির ইতিহাস ও বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ মুক্তিপাগল মানুষের ইতিহাসে উজ্জ্বল হয়ে থাকবে; ততদিন এদের প্রতি ঘৃণা মাখানো প্রতিরোধমুখী ভূমিকা থাকবেই।

বিশেষ করে আজ আমি গাইবান্ধার কথা বলবো, যেখানে জামাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ হয়েছে, হরতাল হয়েছে ; অন্যদিকে জামাত শহীদ মিনার ভেঙেছে, পাকিস্তান জিন্দাবাদ শ্লোগান দিয়ে লুট করেছে, সরকারী পোস্ট-অফিস তছনছ করেছে, এমন কি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্দীপ্ত হওয়া মানুষ-জনের বিরুদ্ধে মিথ্যে মামলা দায়ের করেছে।

গত ১৪ বৈশাখ গাইবান্ধা শহরে প্রকাশ্য জনসভায় গোলাম আযম বক্তৃতা দিবে— এ ধরনের সংবাদ পাওয়ার পরপরই এক ধরনের প্রতিরোধমুখী চেতনা জ্বলে ওঠে, গাইবান্ধা শহরে; এর ফলে খণ্ড-খণ্ড মিছিল, জমায়েত হতে থাকে। ১৪ বৈশাখ গাইবান্ধা পাবলিক লাইব্রেরীর মাঠে জামাত জনসভা করতে পারে নি। একই স্থানে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও একাত্তরের ঘাতক নির্মূল সমন্বয় কমিটির আহবানেও জনসভা ডাকা হয়েছিল। এঁরা পাবলিক লাইব্রেরী সংলগ্ন মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সামনে জনসভা করে কিন্তু জামাত গাইবান্ধা শহরে কোন জনসভা করতে পারে নি। যদিও জামাত স্থানীয়ভাবে আয়োজিত সাংবাদিক

সম্মেলনে বলেছিল যে, তারা ঐ একই তারিখে একই সময়ে একই স্থানে জনসভা করবেই। কিন্তু জনতার প্রতিরোধের মুখে তা করতে পারে নি। অবশেষে লেজ গুটিয়ে প্রশাসনের ছত্রচ্ছায়ায় শহরের বাইরে নতুন গড়ে ওঠা সার্কিট হাউস সংলগ্ন ধানের জমিতে সংক্ষিপ্ত সভা করে, সেই সভায় জামাতের সেক্রেটারী জেনারেল মওলানা মতিউর রহমান নিজামী উপস্থিত ছিল। গোলাম আযম গাইবান্ধায় আসে নি, টের পেয়েছিল পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে যা তার বিপক্ষে শুধু নয়, এ যেন জ্বলে ওঠা আগুন; এলেই পুড়ে যেতে পারে। জামাত সেদিন ধান ক্ষেতে কর্মীদের দিয়ে সভা করে বুঝতে পেরেছিল যে, গাইবান্ধা তাদের বিরুদ্ধে এক দুর্জয় ঘাঁটি। এই গাইবান্ধা শহরে এর আগেও দু'তিন বছরের মধ্যে জামাত কোন জনসভা করতে পারে নি, জনতার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিরোধের মুখে। নির্মূল কমিটির সভায় বক্তারা অঙ্গীকার ঘোষণা করে বলেন যে, ভবিষ্যতে গাইবান্ধার পবিত্র মাটিতে জামাতকে কোন জনসভা করতে দেয়া হবে না।

জামাত গাইবান্ধা শহরে এবার জনসভা না করতে পেরে ১৫ বৈশাখ গাইবান্ধা সদর থানার দাড়িয়াপুর বন্দরে শহীদ মিনার ভেঙে ফেলে। শহীদ মিনার ভাঙার সময় পাকিস্তান জিন্দাবাদ ধ্বনি দিয়ে সেই পুরনো কায়দায় মানুষে- মানুষে ভেদাভেদ সৃষ্টি করার হীন—অভিলাষে সংখ্যালঘুদের দোকানপাট লুটপাট ও ভাঙচুর করে। তারা স্থানীয় রফিকা সঙ্গীত বিদ্যালয় ভাংচুর করে ৫০ হাজার টাকার জিনিসপত্রের ক্ষতিসাধন করে বলে অভিযোগে প্রকাশ। জামাতরা যে বাঙালির সংস্কৃতি-চর্চা পছন্দ করে না, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সঙ্গীত বিদ্যালয় ভাঙার উদাহরণে। তারা সেখানে সরকারি ডাকঘরেরও ক্ষতি সাধন করে। গাইবান্ধা শহরে জনতার সংঘবদ্ধ প্রতিবাদী প্রতিরোধের মুখে না টিকে চোরাগোপ্তা পথে এই হামলায় তাদের হিংস্রতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। এই ধরণের হিংস্রতা বার বার লক্ষ্য করা যায়।

১৮ বৈশাখ দাড়িয়াপুর আঞ্চলিক সমন্বয় কমিটির আহবানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় আওয়ামী লীগ, সিপিবি, ওয়ার্কার্স পার্টি, গণতন্ত্রী পার্টি, বাসদ, জাসদ ও অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরা বক্তব্য রাখেন। এ সভায় দাড়িয়াপুরের লুণ্ঠন ও শহীদ মিনার ভাঙার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও বিচারের দাবি জানানো হয়। যতটুকু জানা যায়, এখনো এ ব্যাপারে কাউকে গ্রেফতার করা হয় নি।

শহীদ মিনার ভাঙার ও লুঠপাটের বিরুদ্ধে ২১ বৈশাখ মুক্তিযুদ্ধের চেতনা

বাস্তবায়ন ও '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল জাতীয় সমন্বয় কমিটি গাইবান্ধা জেলা শাখার ডাকে গাইবান্ধা জেলা শহরে ও উল্লিখিত ঘটনার জায়গা-দাড়িয়াপুরে সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২ টা পর্যন্ত সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। আওয়ামী লীগ, সিপিবিসহ বামপন্থী দলসমূহ, ছাত্র সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংগঠনসহ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকল শক্তি এই হরতালকে সমর্থন জানায়। হরতালের সমর্থনে দাড়িয়াপুরে 'গাইবান্ধা থিয়েটার' নাটকও মঞ্চস্থ করে। জামাত-শিবির প্রতিরোধে গাইবান্ধার জনগণ তাদের ঐতিহ্যের ধারায় সংহত হয়ে গৌরবময় ভূমিকা রাখেন।

স্থানীয় বিএনপি'র অনেকে জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভূমিকা রাখলেও দলীয়ভাবে বিএনপি গত ২২ বৈশাখ দাড়িয়াপুরে এক জনসভা ডেকে নির্মূল কমিটির বিরুদ্ধে সমালোচনা করে। তারা গদবাঁধা বক্তব্যে বলে যে, নির্মূল কমিটি 'গণতান্ত্রিক সরকারের' উন্নয়ন বিঘ্নিত করছে। ঐ জনসভায় বিএনপির বক্তারা আরো বলে যে 'আজ স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা হচ্ছে।'হায়রে বক্তব্য! যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তি; যারা বাঙালির ইতিহাসে সবচাইতে জঘন্য হত্যা, লুণ্ঠন, অরাজকতা সৃষ্টি করেছে; সম্প্রতি আবারো ঐ একই পথে গাইবান্ধার দাড়িয়াপুরে শহীদ মিনার ভেঙে লুঠপাট করে উদাহরণ সৃষ্টি করলো, তারা বিএনপি'র দৃষ্টিতে বিশৃংখলা সৃষ্টির অভিযোগে অভিযুক্ত নয়। দোষী তারাই; যারা এই অপশক্তির বিরুদ্ধে! সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির কারণে এই অপশক্তির বিরুদ্ধে না গিয়ে জামাত-শিবিরের পক্ষে পরোক্ষভাবে ওকালতি করা মানেই স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবজ্ঞা করা, সেই পথে পা বাড়িয়ে বিএনপি ইতিহাসে ও জনগণের কাছে মর্যাদাহীন হয়ে পড়বে সন্দেহ নেই।

গাইবান্ধায় জামাত-শিবির প্রতিরোধের মুখে পড়ার কারণে জামাত পরবর্তীকালে মুক্তিযোদ্ধা, দেশপ্রেমিক ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জ্বল ব্যক্তি ও তরুণদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে পুরনো কৌশলে আইনের মারপ্যাঁচে হয়রানি করছে। গাইবান্ধার জনগণ মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময় থেকে আজ পর্যন্ত এ ধরনের হয়রানির মুখোমুখি বহুবার হয়েছে। বহুবার এই গাইবান্ধা শহরের জনগণ জামাত-শিবিরের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করে সফল হয়েছে। গাইবান্ধা শহরে জামাতের প্রকাশ্য সাংগঠনিক প্রক্রিয়া গাইবান্ধার জনগণের চেতনার কাছে বার বার পরাজিত হয়ে এখন চোরাগোপ্তা পথে এগুবে, এটাই স্বাভাবিক। শুধু গাইবান্ধা শহর নয়, গাইবান্ধা জেলার অন্যান্য এলাকায় জামাত-শিবির যেন ফণা তুলে না

দাঁড়াতে পারে—সেজন্যে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উচ্চকিত রাজনৈতিক দল, ছাত্র-সংগঠন ও সাংস্কৃতিক সংস্থাসমূহ সমন্বিতভাবে ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে; সেজন্যে সংশ্লিষ্ট সবাইকে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। নইলে যে সর্প মাটির পথ পেয়ে গর্ত থেকে বের হয়ে হাঁটা শুরু করেছে – সেই সর্প সুযোগ পেলেই দংশন করবে। শুধু গাইবান্ধা জেলা নয়, দেশের সর্বত্রই এই সর্পের বিষদাঁত ভাঙবো; না-কি দুধ-কলায় পুষবো, এই প্রশ্নের মুখোমুখি আমাদের হতে হবেই। ❑

১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১
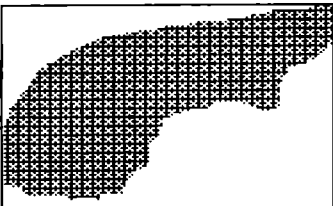
মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ভবিষ্যত প্রজন্মের আচরণ

আমার ছয় বছরের শিশু সন্তানের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়ে উঠলো—ক'দিন আগে - 'লক্ষ শহীদ ডাক পাঠালো, সব সাথীদের খবর দে, সারা বাংলা ঘেরাও করে রাজাকারদের কবর দে।' এই সময়ের বিবেক - তাড়িত উল্লিখিত উচ্চারণ সন্তানের কণ্ঠে শুনে আমি— তো হতবাক! না, এ উচ্চারণ আমার বাসায় তাকে কেউ শিখিয়ে দেই নি বা শুনায় নি। তবে তা কিভাবে এই শিশু-কণ্ঠে উচ্চকিত হল? সন্তানকে জিজ্ঞেস করায় সে বললো, যার মানে দাঁড়ায়, সকালে তোমার সঙ্গে যখন বেড়াতে গিয়েছি, তখনই দেয়ালে ঐ লেখাটি আমি পড়ে নিয়েছি এবং তা মনে রেখেছি। ঐ দেয়ালে উৎকীর্ণ উচ্চারণটি আরো ক'বার আমার শিশু - সন্তানের কণ্ঠে দৃপ্তভাবে উচ্চারিত হতে শুনেছি। আমার সন্তানটি এবার কেজি- প্রথম শ্রেণী'র পরীক্ষা দিয়েছে।

কয়েকদিন পর; বিজয় দিবস পালিত হওয়ার দুইদিন পর—সেই সন্তানের কণ্ঠে উচ্চকিত হলো আরো বিবেক জাগানো উচ্চারণ, তা হল-'গোলাম আযম ফাঁসি থেকে যতবার বাঁচবে, ততবারই ফাঁসি দিতে হবে'। এর অর্থ কি দাঁড়ায়—তা পাঠক মাত্রই বুঝতে পারেন। শিশু-সন্তানটি ইতোমধ্যে টিভিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক অনুষ্ঠান দেখে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রশ্নও করেছে, প্রশ্নের উত্তরও আমাকে দিতে হয়েছে। তার মধ্যে সরলরৈখিক বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধের খানিক ইতিহাস জেগে উঠায় সে মুক্তিযুদ্ধকে অত্যন্ত আপনভাবে নিজের মস্তিষ্কে স্থান দিয়েছে। এবং যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী খুনী রাজাকার, আলবদর হিসেবে অমানবিক কর্মকান্ডে নিজদের নিয়োজিত করে ইতিহাসে ঘৃণ্য পশুতুল্য অবস্থান সৃষ্টি করেছে; তাদের প্রতি স্বাভাবিক ঘৃণা যে জেগে উঠেছে অবচেতন মনেই— তা আমার সন্তানের আচরণ দেখেই অনুভব করেছি। এই প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই যে জেগে উঠেছে, তা আমি বুঝতে পারি।

হ্যাঁ—মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত আহবান, উচ্চারণ, ইতিহাস যে কোন শিশু-সন্তানকেই স্বাভাবিক ভাবে আলোড়িত করবে। আর সে কারণেই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে প্রকাশ্যতায় উজ্জ্বল করা—সচেতন নাগরিক বা অভিভাবকের দায়িত্ব, এ দায়িত্বেই নতুন - প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধকে গৌরবময় উত্তরাধিকার হিসেবে গ্রহণ করে নিজেদের মর্যাদাবান হিসেবে চিহ্নিত করবে।

বিজয় বিদস উপলক্ষে প্রচারিত বাংলাদেশ টেলিভিশনে শহীদদের আত্মীয়-স্বজনের বিশেষত সন্তানদের কণ্ঠে মর্মস্পর্শী বর্ণনা শুনে, আমার সন্তানটি সেই মধ্যরাতে ঘুম থেকে জেগে উঠে বললো— 'গুলি করবো'। কাকে গুলি করবে? তখন সে আধো ঘুমে বললো— পাকবাহিনীকে, রাজাকারদের। এই স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠা কেন ঘটলো, তা স্বপ্নবিশ্লেষক বা মনোবিশ্লেষক পণ্ডিতরা গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে পারবেন কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষও সাধারণভাবে বিবেচনা করে বলতে পারি যে; মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-খুনীদের কেউ ক্ষমা করতে পারে না— যদি কেউ জানে খুনিদের বর্বরতার কথা, নগ্ন হিংস্রতার কথা, লক্ষ স্বজন বা পূর্ব পুরুষদের হত্যা করার কথা।

আর একটি ঘটনা, আমার স্ত্রী বললো যে, কয়েকদিন আগে আমার সন্তানকে নিয়ে সে এক পরিচিত স্বজনের বাসায় গিয়েছিল, সেখানে সমবয়সী ছেলে-মেয়েদের সাথে যুদ্ধ-যুদ্ধ খেলায় নাকি আমার সন্তানকে 'রাজাকার' হয়ে খেলতে বলায় সে রাগে-ক্ষোভে কাঁদতে শুরু করে এবং আর খেলতে চায় নি; পরে মুক্তিযোদ্ধা সাজিয়ে দেয়ার পর তার ক্ষোভ কমে, অতঃপর খেলে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাদীপ্ত পরিবেশ- প্রতিবেশের কারণেই শিশু-সন্তান এভাবে আন্দোলিত হয়েছে, তা বলা চলে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এদেশের শিশুরা যে আন্দোলিত হয়ে উঠেছে, তা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কয়েক বছরের তুলনায় আমাদের এইদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর আন্দোলন ঘনীভূত হয়ে দানা বেঁধে উঠেছে, তা আরো সংহত হচ্ছে। এর প্রভাব শিশুসহ নতুন প্রজন্মকে অবশ্যই গভীরভাবে আন্দোলিত করবে। কেননা মুক্তিযুদ্ধের চিহ্ন, ইতিহাস, স্মৃতি ও মুক্তিযোদ্ধাদের এখনো সর্ম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব হয় নি; এখনো শহীদদের আত্মীয়-স্বজন, শহীদদের কবর ও সৌধ জীবন্ত। মুক্তিযুদ্ধ ফাঁকা হাওয়া নির্ভর নয়, ফাঁকা-শূন্যজাত নয়, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্তধারায় প্রবহমান।

আমার কথা যে, বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় জাগছে, আর সে কারণে সারাদেশে নগরে-বন্দরে, জেলায়-জেলায় 'বিজয় মেলা' অন্যান্যবারের তুলনায় অনেকগুণ বেশি অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব মেলায় শিশুসহ জনগণ উপস্থিত হয়েছে উৎসাহে, অনুপ্রেরণায়। জমায়েত হয়েছে বড়। এসব মেলায় নতুন প্রজন্মের সন্তানেরা গিয়ে ইতিহাস, নিজের গৌরবের কথা জেনেছে। তাদের মানসভূমিতে বপন হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের বীজ, এ বীজ থেকে মহিরূহ যে সৃষ্টি হবে, তা স্বাভাবিক। আগামীতে এ ধরনের মেলার আয়োজন আরো সংগঠিত ভাবে, সুশৃঙ্খলভাবে ও পরিকল্পিত ভাবে হওয়া উচিত।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যার পর থেকে রাষ্ট্রীয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমূলে উৎখাত করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছেঃ মুক্তিযুদ্ধবিরোধী পরিবেশ-পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, বিভ্রান্তি ছড়িয়ে, ইতিহাস বিকৃত করে, পরাজিত শত্রুদের রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠা দিয়ে। এমন অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে বা হয়েছিল যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কথা বলা অপরাধ, মুক্তিযোদ্ধার পরিচয় দেয়া ভয়ের বিষয়। সর্বোপরি পরাজিত শত্রুরাই এদেশের হর্তা-কর্তা হয়ে যেন এদেশের ত্রাণকর্তা হিসেবে আবির্ভূত হয়ে পড়েছে। এই অবস্থা চলতে দেয়া যেতে পারে না, সে উপলব্ধি জনগণ ধারণ করে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে উর্ধ্বে তুলে ধরতে উদগ্রীব । আর এই সময়ে—একাত্তরের ঘাতক নির্মূল কমিটি ও সমন্বয় কমিটি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে জনগণের ভাষাকেই মূর্ত করে তুলেছে।

আজ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে, তা কার্যকরভাবে বিকাশ করার জন্য শুধু মিছিল- সমাবেশ না করে আরো সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালনে তৎপর হতে হবে। একাত্তরের ঘাতক নির্মূল কমিটি ও সমন্বয় কমিটি তাদের শাখা জেলা হতে গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত করতে পারে। এসব শাখা—জেলা, থানা, ইউনিয়ন, গ্রাম পর্যায়ে স্ব-স্ব এলাকার মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, শহীদদের নাম, রাজাকার আলবদরদের নামসহ কুকীর্তি স্থায়ীভাবে ধরে রাখার প্রয়োজনে স্মারক- চিহ্ন, ইতিহাসগ্রন্থ রচনা ও বিশেষ-বিশেষ দিনে মেলা, আলোচনা সভা, অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করার ব্যবস্থা করতে পারে। আমাদের জীবনের অংশ হিসেবে মুক্তিযুদ্ধকে সম্পর্কিত করে তুলে গৌরবময় অবস্থানে সব সময়ের জন্যে উজ্জ্বল করে রাখতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় যে যূথবদ্ধ হয়ে চলা শুরু হয়েছে, তা আরো বেগবান করে সমুদ্রমুখী উত্থানে যেন নতুন প্রজন্মকে স্পর্শমান করা যায়। ❑

১৮ পৌষ ১৩৯৯

মুসল্লির জুতো, আইন ও ব্যক্তির ভূমিকা

দেশে রাজনৈতিক সংকট চলছে, এই সংকটের মধ্যে সুযোগ বুঝে দখলদারী মনোভাবের ভিত্তিতে জামাতের গোলাম আযম পা ফেলছে দেশের বিভিন্ন স্থানে। মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী এ সময়টি জামায়াতের কাছে সব চাইতে ভালো সময়, সে সময়ে গোলাম আযমকে নিয়ে প্রদর্শন করা যাচ্ছে মাঠে-ময়দানে। যাকে একদা বায়তুল মোকাররাম মসজিদের পবিত্র চত্বরে প্রকাশ্যে দেখে সাধারণ মুসল্লিরা জুতোর উপযোগী ভেবে নিজেদের পায়ের জুতো হাতে হাতে নিয়ে ত্বড়িত বেগে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় তাড়িত হয়ে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার দীর্ঘদিন পর, গোলাম আযম বিভিন্নমুখী সুযোগ–সুবিধের ওমে সুপ্ত-গুপ্ত থেকে শক্তি সঞ্চয় করে, আজ এই প্রথম মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তে পবিত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রকাশ্যে দখলদারী শক্তির মত্ততায় জনসভা করছে। যে ব্যক্তি ছিল মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী; লাখ লাখ স্বজনকে খুন করার রাজনৈতিক - মানসিক -শারীরিকভাবে একজন প্রধান সংগঠক এবং বিভিন্ন অভিযোগে দুষ্ট / সে আজ রাষ্ট্র, সরকার, রাজনৈতিক দলগুলোকে চ্যালেঞ্জ দিয়ে পথে নামছে। সেক্ষেত্রে আজ রাষ্ট্র, সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো ব্যর্থতার পরিচয় দিচ্ছে। যদি আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নির্ভর আদালতে দাঁড়াই, তাহলে তাই বিবেচিত হবে।

লাখ লাখ শহীদদের জীবনের বিনিময়ে আর সাধারণ মানুষের ত্যাগে যে মুক্তিযুদ্ধের ভিত্তি আমরা গোড়াপত্তন করেছি, সেই ভিত্তির ওপরেই বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রটি গড়ে উঠেছে। তাই, এই রাষ্ট্রের সর্ব-অস্তিত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করি। রাষ্ট্র গঠন হয়েছে বলেই আমরা আজ সরকার গঠন করতে পারছি, রাজনৈতিক দলগুলো তাদের কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের উৎসের বিপরীতে যে বিরুদ্ধ কাল- বলদর্পী শক্তির অবস্থান; তারা যদি রাষ্ট্রে, সরকারে, রাজনৈতিক দলে জায়গা করে নেয়ার সুযোগ পায়, তাহলে মুক্তিযুদ্ধের মৌল-ভিত্তিকে আঘাতে আঘাতে তারা নষ্ট করবে, এটাই যুক্তিযুক্ত ও স্বাভাবিক। ইতিমধ্যে আমাদের অস্তিত্বের ভিত্তিভূমি অনেক ক্ষেত্রে এই কাল-বলদর্পী - কীটদের দংশনে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে।

ওরা আজ জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিচ্ছে, ইতিহাস বিকৃতির প্রকল্প নিয়ে

কোমল শিশুদের মস্তিষ্কে অন্য ইমেজ তৈরি করছে। যারা ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হচ্ছে, তাদের রগ কাটছে, হত্যার উল্লাসে জীবন নিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে তাদের কাছে কোনো দল বা ব্যক্তি বড় নয়, বড় হচ্ছে ওদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী চরিত্র। যারা প্রতিবাদে-প্রতিরোধে শক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে, তাদেরই তারা টার্গেট করে হত্যা করছে। যে বিএনপি দুধ–কলা দিয়ে পুষেছে এই কাল–-সাপদের, সেই বিএনপির লোকজনকেও তারা আজ ছোবল দিতে পিছু পা হচ্ছে না। অন্যান্য দল, যারা তাদের বগলে নিয়ে আনন্দিত, তারাও ওদের ছোবলে অতীতে বাঁচে নি, ভবিষ্যতেও বাঁচবে না। এ সরল-বিবেচনা সাধারণ মানুষ নিকট অভিজ্ঞতা থেকে হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছে। কিন্তু ক্ষমতা ও রাজনীতির মারপ্যাঁচে এদের বার বার গুরুত্ব দেয়ার ফলে, এরাই গুরুত্ববান হয়ে উঠেছে আজ। এই আত্মঘাতি খেলায় বার বার আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর দল ও ব্যক্তি জব্দ হচ্ছি, হওয়ার পরও পথ ও মত পরিবর্তন করছি নে।

মুক্তিযুদ্ধ থেকে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সে রাষ্ট্রীয় অবস্থানে পুরানো ও অন্যান্য আইনের আশ্রয়ে চিহ্নিত শত্রুরা আরও শক্তি সঞ্চয় করবে, নিজেদের কুকীর্তি থেকে রেহাই পেয়ে মাঠ-প্রান্তর দখল করবে; তা মুক্তিযুদ্ধের পরিপূরক হতে পারে না। আইন মানুষ তৈরি করে, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি, নৈতিকতা, স্বার্থ ও বিবেচনায় আইন গড়ে ওঠে। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, আমরা সবচাইতে ঘৃণ্য- শয়তান, খুনী ও ইতিহাসের সত্যতায় চিহ্নিত ব্যক্তিদের বিচার করে শাস্তি দেয়ার পথ সুগম করি নি। প্রয়োজনে আইন তৈরি করে নি, আইন বদলাই নি। মুক্তিযুদ্ধকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে কোন বিশেষ আইন নেই। লাখ লাখ শহীদদের রক্তের বিনিময়েও যদি মুক্তিযুদ্ধের পরিপূরক আইন আমরা তৈরি না করতে পারি, তাহলে রাষ্ট্রের উপর- কাঠামোতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কিভাবে শক্তিশালী হবে? মুক্তিযুদ্ধকে সংরক্ষণ ও বিকাশের জন্যে আইনের সুরক্ষা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ডের পর সরকারি অবস্থান থেকে বার বার মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে নষ্ট করায় উদ্যোগ গ্রহণ করে ফলপ্রসূ করা হয়। আজ বেসরকারি পর্যায়ের ভূমিকাও সেই উদ্যোগের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ, এ অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধকে উজ্জ্বল করার মানবিক-আইনের গোড়াপত্তন হয় নি, হচ্ছে না। এইজন্যে, খুনীরা আজ মহা-দাপটে উল্লাস মুখরতায় মুক্তিযুদ্ধকে হেলাফেলা করে রাখছে অনেকটা। খুনীরা গণতন্ত্রের নামে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে, প্রাইভেট বাহিনী তৈরী করে, আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে, যুদ্ধাবস্থার মত বিভিন্ন এলাকা থেকে তথাকথিত ক্যাডার নিয়ে এসে গোলাম আযমের মত চিহ্নিত ব্যক্তিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শন করছে। তারা তাদের সাংগঠনিক শক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার এক্ষেত্রে করছে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর

শক্তি বলে পরিচিত সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধভাবে জোরালো উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারছে না। বিভ্রান্তি আর রাজনৈতিক কৌশল নামের ভূমিকা এক্ষেত্রে অনেকাংশে দায়ী। জামাত এ ধরনের সুযোগ ষোল আনা ব্যবহার করছে।

জামাত প্রধান বড় শহরে গিয়ে হইচই বাধালেন, জনসভা নামীয় ক্যাডারভিত্তিক কর্মি সভায় বক্তৃতা দিয়ে খায়েস মিটালেন। এর বিপরীতে সেইসব শহরে সাধারণ জনগণ হরতাল করলো, প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করলো। পরবর্তীকালে জাতীয় দৈনিকসমূহে সমন্বয় কমিটির ধন্যবাদভিত্তিক বিবৃতি ছাপা হল। বলতে দ্বিধা নেই, সমন্বয় কমিটির নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ ভেবে ছিল, বিজয়ী আন্দোলন গড়ে উঠবে, আরো সংহতভাবে এগিয়ে যাওয়া যাবে, কিন্তু তা হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের সাহসী স্পর্ধা ও চেতনা রয়েছে, তা শহীদ জননীর নেতৃত্বে সমন্বয় কমিটির মাধ্যমে সংহত হয়েছিল ও জেগে উঠেছিল। আজ কিন্তু সেই জেগে ওঠার প্রবাহ রাজনীতি নামীয় সংকীর্ণ সুতোর টানে চোরা-স্রোতে খানিক হলেও আটকা পড়েছে। ব্যক্তিগতভাবে মানুষের চেতনার মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ মর্যাদার সঙ্গেই অবস্থান করছে। সেই চেতনাকে কোন শক্তি নেই, পুরোপুরি অবদমিত করে রাখে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংহত করার ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দল ও অন্যান্য সংগঠনের প্রতি বিশেষ আস্থা আজ নেই বলে, মানুষ সাংগঠনিকভাবে সংহত হয়ে পথে নামছে না। কিন্তু কোন নেতৃত্ব ও সংগঠনের প্রতি আস্থাশীল হলে সাধারণ মানুষ আবারো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় ঐক্যবদ্ধ ও সংহত ভূমিকায় নামবে। সন্দেহ নেই।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংরক্ষণ ও সমৃদ্ধ করার জন্যে ব্যক্তির ভূমিকা কম তাৎপর্যপূর্ণ নয়। ব্যক্তি তার ব্যক্তিগত সচেতন ভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদা তুলে ধরার জন্যে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারেন। বিছিন্নভাবেও দলে-প্রতিষ্ঠানে-পরিবারে ও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী দ্বন্দ্বকে জাগ্রত করে ব্যক্তির ভূমিকা উজ্জ্বল হতে পারে। ক'দিন আগে এক স্বজনের বোনের বিয়েতে দাওয়াত খেতে গিয়ে শুনলাম যে, বর ও বর পক্ষের লোকেরা বিয়ের আগে জানতে চেয়েছিল যে, সেই স্বজনের পরিবারে কেউ রাজাকার আছে কি না। এটাই তাদের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল। ধন্যবাদ, এ ধরনের সামাজিক ভূমিকায় মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে গ্রহণ করার জন্যে। ব্যক্তিগত সচেতনায় রাজাকার-আলবদরদের বিরুদ্ধে এভাবে ঘৃণা ও ভূমিকা আরও সচেতনভাবেই নেয়া উচিত। আজকের কাগজ কার্যালয়ে লেখা — এখানে রাজাকারের প্রবেশ নিষেধ। এটাও কম কি। তাই ব্যক্তিগতভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ইজারা কোথাও না দিয়েই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে সংরক্ষণ করা যায়।

তবে এ বলছি না যে, সম্মিলিত ভূমিকায় রাষ্ট্রে, সরকারে ও রাজনৈতিক দলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থাকবে না। অবশ্যই তা জরুরি, কিন্তু তা যখন বিভিন্ন কারণে হচ্ছে না, তখন ব্যক্তির ভুমিকা কম কিসের।

মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধ আমাদের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে উর্ধ্বে তুলে ধরে রাখা উচিত, এক্ষেত্রে জাতীয় ঐকমত্য সবসময় কাঙ্ক্ষিত। কিন্তু আজ তা হচ্ছে না বলেই মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধ-শক্তির প্রতিভূ গোলাম আযম গণতন্ত্র নামীয় সুযোগে রাজনৈতিক-ময়দান প্রকাশ্যে দখল করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। এ দুঃসাহস আমাদের সম্মিলিত সাহসের কাছে খুবই গৌণ আর ক্ষুদ্র বলেই মনে করি। আমাদের পদশব্দ যদি সংহত হয়, সম্মিলিতভাবে তা উচ্চকিত হয়, কোন সময়ে; তবে গোলাম আযমের বুকের শব্দ দ্রুত বাড়বে বৈ কমবে না। সেই সাথে তার সহযোগী বলদর্পী-কীটেরা প্রোটিনের অভাবে তাদের রুটিন মাফিক নাটকীয় শক্তি হারাবে এবং ধুলোমাখা পরিণতিতে কাতরাবে। ❑

২০ অগ্রহায়ণ ১৪০১

রবীন্দ্রনাথ, কায়রো সম্মেলন ও চিহ্নিত গোষ্ঠীর আওয়াজ

রবীন্দ্রনাথ ১৯২৬ খৃঃ সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে। পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃত মার্গারেট স্যাংগারের কাছে লেখা চিঠিতে উল্লিখিত খৃষ্টাব্দে তিনি বলেনঃ 'আমি মনে করি জন্ম নিয়ন্ত্রণের আন্দোলন একটি বৃহৎ আন্দোলন। কারণ, এতে যেমন একদিকে মহিলারা বাধ্যতামূলক ও অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব থেকে অব্যাহতি পাবে তেমনি অন্যদিকে দেশের সীমিত রসদ ও সামর্থ্যের বাইরে খাদ্য ও বাসস্থানের জন্যে বিশৃঙ্খলভাবে বেড়ে ওঠা উদ্বৃত্ত জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে। ভারতের মতো দুর্ভিক্ষপীড়িত দেশে অধিক শিশুর আগমন একটি নিষ্ঠুর ও অমার্জনীয় অপরাধ। এর ফলে শিশুর জীবনে নেমে আসবে সীমাহীন দুর্ভোগ, গোটা পরিবারের জীবনযাত্রার মান আশংকাজনকভাবে ক্রমাবনতি ঘটবে। এটা স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্যতাজনিত যে অসহায়ত্ব তা অধিক জনসংখ্যা কমাতে সাহায্য করে না। অতএব, এ ক্ষেত্রে এটাই প্রমাণিত হয় যে, বিচক্ষণ সভ্য সমাজের সর্তকীকরণ বাণী সত্বেও প্রাকৃতিক চাহিদা বিজয়ী হচ্ছে। কাজেই আমি বিশ্বাস করি, মানুষের বিবেক ও নীতিবোধ কবে জাগ্রত হবে তার জন্যে অপেক্ষা না করে অসংখ্য প্রজন্মের নিরপরাধ শিশুকে বঞ্চনা আর অকাল মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করে জঘন্য সামাজিক অবিচার প্রতিহত করা প্রয়োজন। আপনি যে কাজে মনোনিবেশ করেছেন এবং যে কারণে অশেষ দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন তার জন্যে আমি কৃতজ্ঞ।'

৬৮ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যে সুস্পষ্ট বক্তব্য পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে রেখে ছিলেন, তা দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানুষের পরিচয়কে তুলে ধরে। যখন রবীন্দ্রনাথ এ মতামত ব্যক্ত করেন তখন এই ভারতবর্ষে পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে সামাজিক কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয় নি বা এ সম্পর্কে বিচার বিবেচনা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও গৃহীত হয় নি। মার্গারেট স্যাংগার তখন পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গী সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য করার জন্যে ভূমিকা রাখছেন—আমেরিকায়। এ জন্যে মার্গারেট স্যাংগারকে মামলা, গ্রেফতার ও অন্যান্য হয়রানির মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু তাতে তিনি দমে যান নি। শুধু যুক্তরাষ্ট্রে নয়, বিশ্বের অন্যান্য দেশে পরিবার

পরিকল্পনা সম্পর্কিত বিবেচনা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে তিনি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৩০ খৃঃ তিনি জুরিখে একটি বিজ্ঞান সম্মেলনের আয়োজন করেন। ১৩০ জন বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি এতে অংশ নেন। ১৯৫২ খৃঃ ২৪ নভেম্বর ভারতের বোম্বাই শহরে এ বিষয়ে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। মার্গারেট স্যাংগার এতে নেতৃত্ব দেন। আর বাংলাদেশে ১৯৫৩ খৃঃ পরিবার পরিকল্পনা আন্দোলন শুরু হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের সাফল্য নিয়ে সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অনেক কথা বলে থাকেন। এসব কথা অনেকটা সত্য হলেও ভোটের আকাঙ্ক্ষায় ও মৌলবাদীদের অপপ্রচারে মাঝে মাঝে তারা সংশয়ে ভোগেন বলে মনে হয়। প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া কায়রোতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনে যোগ দেয়ার ঘোষণা দিয়েও আবার তা প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। যদিও অন্য জরুরী কাজে তার না যাওয়া হয়ে থাকে, তবে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু মৌলবাদীদের অপপ্রচার ও চাপে যদি তিনি না গিয়ে থাকেন, তবে তা বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচীর যে ভাবমূর্তি দেশ ও দেশের বাইরে রয়েছে, তাকে কি ক্ষুণ্ন করবে না?

জাতিসংঘ আয়োজিত কায়রোর জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক সম্মেলনের জন্য গৃহীত দলিলে বিভিন্ন প্রস্তাবনা রয়েছে। সেসব প্রস্তাবনা নিয়ে কায়রো সম্মেলনে আলোচনা, বিতর্ক ও বিবেচনা হতে পারে, তা স্বাভাবিক। কিন্তু কোন কোন ধর্মান্ধ মহল কায়রো সম্মেলনকে বাতিল বা বন্ধ করার জন্যে বিভিন্ন হুমকি, অপপ্রচার ও নানা অপযুক্তি দিয়েছে। যা সম্মেলনের মূল লক্ষ্যকে পেছনে ঠেলে দেয়ার অপপ্রয়াস বলেই মনে হয়। এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত করার আগে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রস্তাব গ্রহণ করে—আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে দলিলের রূপরেখা প্রণয়ন করা হয়।

গৃহীত দলিলে কি রয়েছে? তা পুরোপুরি না জেনে না শুনে অনেকে এ সম্মেলনের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়ে তাদের কুমতলবী ভূমিকাকে তুলে ধরছে। খৃষ্টান ও মুসলিম মৌলবাদীরা, যারা আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীকে যুক্তিপূর্ণ বলে মনে করেন না, তারা অপপ্রচার চালিয়ে বিভ্রান্তি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মানবিক কল্যাণের যৌথ ভূমিকাকে খাটো করতে চাইছে। এরা সম্মেলনের গৌণ বিষয়কে মূখ্য করে তুলে মূর্খতার পরিচয় দিচ্ছে বলে মনে হয়।

কায়রোর সম্মেলনের দলিলে মহিলাদের ক্ষমতায়ন, শিশু রক্ষা, দারিদ্র্য বিমোচন ও শিল্পায়িত দেশগুলো থেকে অধিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে প্রস্তাব রয়েছে। খসড়া চুক্তিতে আরও প্রস্তাব রয়েছে যে— দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা মোকাবেলা করে পরিবারের আকার ছোট করা, যাতে পরিবারকে সহায়তা করা যায়। এর

ফলে উন্নত শিক্ষা ও পরিবার পরিকল্পনা-সেবার মাধ্যমে পরিবারকে আরও শক্তিশালী করা সম্ভব।

বিশ্বের অন্যান্য কিছু অন্ধ মৌলবাদী গোষ্ঠীর আওয়াজের সঙ্গে বাংলাদেশের কিছু অন্ধ চোখওয়ালা শক্তিও কায়রো সম্মেলনের বিভিন্ন বিষয়কে যুক্তিযুক্তভাবে সমালোচনা না করে—মিথ্যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এদের মধ্যে জামাত বলেছে যে, কায়রো সম্মেলনের জন্য গৃহীত দলিলে নাকি অবাধ গর্ভপাত, শিশু-কিশোরদের যৌন স্বাধীনতাকে নিশ্চিত করা হয়েছে, বিয়ে ছাড়াই নারী-পুরুষের পরিবার গঠনের অনুমতি দেয়া হয়েছে, সমকামিতাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। আসলে যারা খসড়া দলিল পড়েছে তারা জামাতের তথাকথিত অভিযোগকে সত্য বলে মনে করতে পারবে না। বরং দলিলে পরিবারকে সমাজের মূল ইউনিট হিসেবে চিহ্নিত করে পরিবার পরিকল্পনাকে মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে কোন জবরদস্তির অবকাশ না রেখে যৌন ব্যভিচারকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। দলিলে কোথাও সমকামিতা কিংবা বিবাহ বহির্ভূত যৌন সম্পর্কের বিষয়ে উল্লেখ নেই। সমাজ ও দেশের পার্থক্য থাকার কারণে পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক সকল মতামত একই ধরনের হবে, তা ঠিক নয়। কিন্তু পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মসূচী আজ সারা বিশ্বে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, তা প্রয়োজনে ও মানুষের সচেতন বিচার-বিবেচনায়। এক প্রজন্ম আগে গুটি কয়েক দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম ছিল, আজ শতাধিক দেশে সে কার্যক্রম বিস্তৃত হয়েছে। আজ যখন কিছু সংখ্যক মৌলবাদী শাসক শাসিত দেশ ও মৌলবাদীরা এ বিষয়ে হইচই করছে— তখন আমরা লক্ষ্য করছি যে— মেক্সিকো, ব্রাজিল, কলম্বিয়ার মতো ক্যাথলিক দেশ এবং ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, তিউনেশিয়ার মতো মুসলিম অধ্যুষিত দেশে পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম অত্যন্ত শক্তিশালী।

বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা ৫শ' ৬০কোটি। ১৯৫০ খৃঃ ছিল এর অর্ধেক। এখন যে হারে জনসংখ্যা বাড়ছে, তা চলতে থাকলে ২০২৫ খৃঃ জনসংখ্যা দাঁড়াবে ৮শ' কোটি। এর বেশির ভাগ জনসংখ্যা বাড়বে এমন সব এলাকায়, যেসব এলাকায় ক্ষুধা, স্বাস্থ্য সেবা ও অন্যান্য মৌলিক অধিকার থেকে মানুষ অনেকাংশে বঞ্চিত। তাই বিষয়টি হেলা ফেলা করে ভাববার বিষয় নয়। এরজন্য সময়োপযোগী উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। পরিবার পরিকল্পনা ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে সবার দৃষ্টিভঙ্গী এক না হলেও কিছু কিছু বিষয়ে ঐকমত্যে যদি পৌঁছানো যায়—কায়রো সম্মেলনের মাধ্যমে; তা কি মন্দের ভালো নয়? ❑

১ আশ্বিন ১৪০১
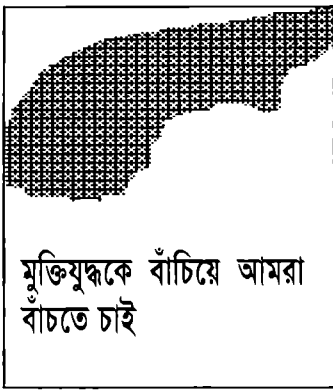
মায়ের সাথে শিশু-সন্তান প্লাকার্ড হাতে নিয়ে রাজপথে এসেছে এবং প্লাকার্ডে উচ্চকিত করেছে ঃ 'ওরা আমার নানাকে হত্যা করেছে'। প্রজন্ম-৭১ নামের সংগঠন গত ৩ কার্তিক জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে যে সমাবেশের আয়োজন করেছিল, সেই সমাবেশে উল্লিখিত কথা তুলে ধরা হয়েছিল। গভীর বেদনাহত উচ্চারণ। যে শিশুদের হাতে এই পোষ্টার প্লাকার্ড ছিল, তাদের নানারা আজ নেই, মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। এ রকম হাজার হাজার শিশু তাদের নানা কিংবা দাদাদের স্নেহ থেকে আজ বঞ্চিত। এই দেশে, এই লোকালয়ে। তারা বড় হয়ে নানা-দাদাদের অভাব আরও অনুভব করবে। উল্লিখিত সমাবেশের আয়োজকরা বর্তমান রাজনৈতিক সংকট নিরসনে আসা স্যার নিনিয়ানের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। তারা মনে করেছে, নিনিয়ান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মিত্র-শক্তির সৈনিক, তাই তিনি জাতীয় রাজনৈতিক সংকট সমাধানের লক্ষ্যে অনুষ্ঠিতব্য সংলাপে জামাতকে বর্জন করবেন, এ ধরনের দৃষ্টিতে তারা নিনিয়ানের প্রতি স্মারকলিপি পেশ করে মানবিকতার মর্যাদাকে উর্ধ্বে তুলে ধরার একটি পদক্ষেপ নিয়েছেন। যারা আমাদের দেশে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত এবং মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-শক্তি হিসেবে গৌরববোধ করেন, তারাতো জামাতকে বর্জন করছে না; আর নিনিয়ান কি জামাতকে বর্জন করতে পারবেন?

প্রজন্ম '৭১ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা, তারা স্বজন হারানোর গভীর বেদনা থেকে উৎসারিত দাবি জানিয়েছেন। তা স্বাভাবিক ও যুক্তিযুক্ত। সমন্বয় কমিটি ক'দিন আগে জামায়াতের সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ বা কোন ধরনের সংশ্লিষ্ট হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, সমন্বয় কমিটির কাগুজে-বিবৃতি কোনোরূপ প্রভাব ফেলছে না। এ বিষয়ে।

শহীদ জননীর নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ ও বিকাশে যেভাবে যূথবদ্ধ হয়ে আন্দোলনের ধারা শুরু হয়েছিল, সেই ধারা থেকে শক্তিময় এক উত্থানে মুক্তিযুদ্ধ আবার জেগে উঠেছিল। মানুষের মধ্যে আশাবাদ ছিল যে, এবার আমরা জয়ী হয়ে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের অনেকাংশে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে উৎখাত করতে পারবো। কিন্তু সেই আশাবাদ আজ চোরাস্রোতে আটকা পড়েছে। সেই চোরা-স্রোতের কারণে একাত্তরের পরাজিত শত্রুরা নতুন শক্তিতে অনেকের

সঙ্গী হয়ে সহজভাবে সহজ পথে এগিয়ে যাবার স্বপ্নে বিভোর হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকে হেলাফেলা করা, মুক্তিযুদ্ধকে নিয়ে বহুক্ষেত্রে সংকীর্ণ ভেদবুদ্ধিপূর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধি উদ্ধার করার নাটকীয় ঘটনা ইতিপূর্বে আমরা লক্ষ্য করেছি, এখনো করছি। যার ফলে বার বার মুক্তিযুদ্ধের যূথবদ্ধ অঙ্গীকার ও মর্যাদা নষ্ট হয়েছে। আমরা সবক্ষেত্রে ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও মর্যাদাকে সংরক্ষণ করতে পারি নে। এসব কারণে রাজনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে এবং সামাজিক জীবনে মুক্তিযুদ্ধের সম্ভাবনাময় বিকাশ বার বার রুদ্ধ হয়ে পড়েছে।

একাত্তরের ঘাতকরা আজ বড়ই আহ্লাদে আর ধৃষ্টতায় কথা বলছে। গোলাম আযম ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম পৌঁছে জনসভা করার সুযোগ পাচ্ছে। রাজশাহীতে বোমাবাজি, লুট, দাঙ্গা করে জনসভা করলো। দেশের অন্যান্য শহরে গিয়ে পা ফেলার স্পর্ধা দেখাচ্ছে। গত ১৪ ভাদ্র বায়তুল মোকাররম মসজিদের উত্তর গেটে এক সমাবেশে জামাতের আব্বাস আলী খান বলেছে, 'মুসলিম জাহানের নন্দিত নেতা গোলাম আযমের ফাঁসি দাবি করাতেই আল্লাহ সমন্বয় কমিটির নেত্রী জাহানারা ইমামের মুখে ক্যান্সার দিয়েছিলেন।' উল্লেখ্য, শহীদ জননী জাহানারা ইমাম একাত্তরের ঘাতক দালালবিরোধী আন্দোলন শুরু করছিলেন'৯১তে। আর তিনি ক্যান্সারে আক্রান্ত হন '৮০ খৃঃ। শহীদ জননী সম্পর্কে তাচ্ছিল্যপূর্ণ ও যুক্তিহীন কথা বলে অরুচিকর ও অনৈতিক চেহারার পরিচয় দিয়ে ঘাতকরা আজ স্রষ্টা সম্পর্কে মনগড়া বক্তব্য দিয়ে প্রাথমিকভাবে ধর্মীয় মূল্যবোধকে খাটো করছে। এরা গোলাম আযমকে আজ 'নন্দিত নেতা' হিসেবে চিহ্নিত করছে, আর মুক্তিযুদ্ধে পুত্রহারা শহীদ জননীকে খুশীমত বিকৃত মন-মানসিকতা- নির্ভর বিবেচনায় টেনে আনছে। প্রশ্ন হলো, জামাতের কোন নেতা ও কর্মীর ক্যান্সার হয় না বা কঠিন অসুখে মৃত্যু হয় না? ঘাতকদের এ ধরনের কুরুচিপূর্ণ যুক্তিহীন ব্যাখ্যা নির্ভর মন-মানসিকতার কাছে শহীদ জননীর মত শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্বের মর্যাদাকে আমরা হেয় হতে দেখছি! মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন হওয়া এই দেশে ঘাতকরা আজ বাক-স্বাধীনতার সুযোগ নিয়ে মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাকে যত্রতত্র খুশীমত নষ্ট করছে!

শুধু কি জামাত? গত ১৩৯৯ সনের ১৫ আষাঢ় ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের মধ্যে এক 'সমঝোতা চুক্তি' সম্পাদন হয়। বিএনপি গণমানুষের মুক্তিযুদ্ধ চেতনা নির্ভর আন্দোলনের কারণে এ সমঝোতা চুক্তি করতে বাধ্য হয়। কিন্তু সে চুক্তি বিএনপি রক্ষা করে নি। বিএনপি অনেক অঙ্গীকার ভঙ্গ করার মধ্য দিয়ে আজ ক্ষমতায় রয়েছে। ক্ষমতায় যাওয়ার আগে অনেক অঙ্গীকার করেছিল, এরশাদ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে জোটবদ্ধ অঙ্গীকারের প্রতি আস্থা রেখেছিল কিন্তু সেসব অঙ্গীকার পালন করে নি। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সম্পর্কিত এসব

অঙ্গীকার পূরণ না করে বিএনপি জনগণের সাথে কি বিশ্বাসঘাতকতা করে নি? সমঝোতা চুক্তির প্রথম দুটি দফা হচ্ছে ঃ সরকার গোলাম আযমের বিচার করবে ও ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিকের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত দেশদ্রোহিতার মামলা তুলে নিবে। হায় ট্রাজেডি! গোলাম আযম আজ এদেশের নাগরিক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে প্রকাশ্য জনসভায় বক্তৃতা দিচ্ছে, আর ২৪ জন বিশিষ্ট নাগরিকের ওপর দেশদ্রোহিতার মামলা ঝুলছে!

শহীদ জননী দেশদ্রোহীতার মামলা নিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন! ক্ষমতা আর রাজনীতির দুষ্টগ্রহ- আক্রান্ত- মারপ্যাচে মুক্তিযুদ্ধ আজ অবহেলায় ধুলোমাখা বিবর্ণ পাতা; কখনো বা ক্ষমতার সিঁড়ি হিসেবে ব্যবহৃত! এই অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধ কিভাবে নিরাপদ থাকবে? শহীদ জননী আজ নেই, তাঁর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা মুক্তিযুদ্ধের চেতনা থেকে উৎসারিত আন্দোলিত ধারা কি আর বিকশিত হবে না? সমন্বয় কমিটি শহীদ জননীর নেতৃত্বের শূন্যতা থেকে সাংগঠনিক শক্তিকে আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না? রাজনৈতিক দলগুলো কি জনগণের মুক্তিযুদ্ধ নির্ভর চেতনাকে মর্যাদা দিয়ে আগের মত ঐক্যবদ্ধ থাকবে না? এসব সরলরৈখিক প্রশ্ন মনের মধ্যে দোলা দেয়।

নেতৃত্বের দুর্বলতা, ক্ষমতার মোহ ও অন্যান্য কারণে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ ও বিকাশে যূথবদ্ধ প্রয়াস ব্যাহত হচ্ছে। অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত শত্রুরা রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা পেয়ে রাষ্ট্র —প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির সুযোগ নিয়ে সামাজিক জীবন কলুষিত করছে; সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের মূল্যবোধকে ক্রমান্বয়ে নষ্ট করার প্রয়াস পাচ্ছে। কিন্তু ভুললে চলবে না যে, সাংগঠনিকভাবে ঐকমত্যের ভিত্তিতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-নির্ভর অনুরণন চোরাস্রোতে আটকে পড়লেও ব্যক্তি মানুষের রক্তে সেই অনুরণন এখনো আছে। নতুন প্রজন্ম; যারা শহীদদের উত্তরসুরি, তাদের নতুন রক্তেও মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় অনুরণন শোনা যায়। এই অবস্থায় মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী আন্দোলনকে বার বার যারা চোরাস্রোতে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে আটকে রাখতে চায়, তাদের চেহারা ধরা পড়ছে। ফাঁকি দিয়ে সবার আঁখিতে ধুলো দেয়া যাবে না।

প্রজন্ম '৭১ এর সমাবেশে নানার হত্যার বিচার চেয়ে যে শিশুটি রাস্তায় মায়ের হাত ধরে এসেছে, সেই শিশুর মত লাখ লাখ শিশুকে আজ পথে নিয়ে আসতে হবে। সেই সব শিশুরা আসবে মা-বাবার হাত ধরে, যেসব মা-বাবা তাদের প্রিয় মা-বাবাকে হারিয়েছে মুক্তিযুদ্ধে। কেউবা হারিয়েছে বোন বা ভাইকে বা নিকট আত্মীয়কে। তাঁরা সকলে তাঁদের সন্তানকে নিয়ে পথে নামুক। হত্যাকারীদের বিচারের দাবিতে সোচ্চার হোক। উৎখাত হোক— ইতিহাসের ঘৃণ্য মানুষরূপী

পশুরা; যারা আজ পায়ের তলায় মাটি পেয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী উৎপাত শুরু করেছে। শুধুমাত্র যূথবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমেই মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী আন্দোলন লক্ষ্যমুখী হতে পারে, চোরাস্রোত থেকে বাঁচানো যেতে পারে।

প্রিয়-স্বজন হারিয়ে আমরা আজ মুক্তিযুদ্ধকে হারাই নি এবং শহীদ স্বজনেরা মুক্তিযুদ্ধকে উত্তরাধিকারের হাতে রক্তবর্ণ ফুলে উপহার দিয়ে আমাদের হৃদয়ে জীবন্ত রয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধ শহীদদের রক্ত থেকে উৎসারিত এক অনুরণন, যে অনুরণন আজ উত্তরাধিকারের রক্তে অনুরণিত হচ্ছে; আগামীতেও হবে। আজ তাই মুক্তিযুদ্ধকে বাঁচিয়ে আমরা বাঁচতে চাই। ❑

১০ কার্তিক ১৪০১
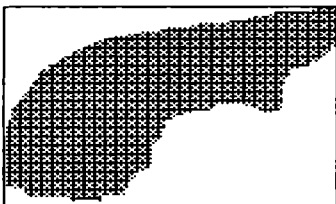
শহীদ জননীর প্রত্যাশা এবং মুক্তিযুদ্ধের শত্রু-মিত্র

জামাতের সঙ্গে উদারতায়, কৌশলে আর যেকোন রাজনৈতিক যোগাযোগে গড়ে ওঠা ভূমিকা মানুষের মধ্যে যে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রবহমান; তাকে আহত করে। এ কথাটা যাদের উপলব্ধিতে আসে না বা আসলেও অন্য কোন যুক্তি এনে দায় সারতে চান, তারা তাদের কতটুকু ক্ষতি করছেন; সেই বিবেচনা না এনেও বলা যায় যে—এতে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় অগ্রসরমান ধারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বা হচ্ছে; তা সাধারণ মানুষ সাধারণ বিবেচনায় উপলব্ধি করছেন।

শহীদ জননী জাহানারা ইমাম আজ নেই কিন্তু তাঁর নেতৃত্ব বা প্রতীকময়-ঐশ্বর্যে যেভাবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ঐক্যসূরে বেজে উঠেছিল, রূপ পেয়েছিল সংহতভাবে, সেই ধারাতো মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উন্মিলিত ধারা। আর এই ধারার মূল-বিরোধী ধারা রাজনৈতিকভাবে, দর্শনগতভাবে, সাংগঠনিকভাবে যে দলটি ধারণ করে বর্তমানে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে রয়েছে—সেটি জামাত। আর এই জামাতেই মুক্তিযুদ্ধের সময়ে যে অমানবিক মধ্যযুগীয় চেতনা-নিয়ন্ত্রিত কালজ্ঞ-ভূমিকা পালন করেছিল, সেই ভূমিকা থেকে এক চুলও সরে দাঁড়ায় নি। জামাতের উৎসাহ আর নিয়ন্ত্রণে যে কু-ধারা সৃষ্টি হয়েছে, তার আওতায় মুক্তিযুদ্ধের যাবতীয় অর্জন নষ্ট হয়ে পড়বে; যদি আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে তাদের মোকাবেলা করতে না পারি। এই ব্যর্থতার দায়ভাগে থাকবে কারা? এটা ভাববার সময় এসেছে।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সংরক্ষণ ও বিকাশে শহীদ জননী সমাজের অস্ফুট ভাষাকে মূর্ত করে তুলেছেন। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর সরকারি মদদে মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদা বার বার আঘাতে আঘাতে দুঃখজনক পরিণতি নিয়ে পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে; আর এ দেখে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত মানুষেরা যখন দিশেহারা, তখনই শহীদ জননীর রূপকল্পে মানুষেরা হয়ে উঠেছে আবারো সংঘবদ্ধ। এই সংঘবদ্ধ এগিয়ে চলার গতি মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে করেছে—শাণিত। এই অবস্থা—মুক্তিযোদ্ধাদের কোন একক সংগঠন, মুক্তিযুদ্ধের ধারায় কোন একক রাজনৈতিক দল বা সামাজিক সংগঠন সৃষ্টি করতে পারে নি। তাদের সকলের একক ব্যর্থতার গ্লানি পুষিয়ে নিয়ে সম্মিলিত যোজনায় যে মুক্তিযুদ্ধের অনুরণন সৃষ্টি হয়েছে, তা বাঁচিয়ে রেখে মানুষকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় বাঁচাবার পথ প্রশস্ত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট সবার ঐক্যবদ্ধ তৎপরতার বিকল্প নেই।

জামাত আজ উপলক্ষ্য সৃষ্টি করে, অছিলা খুঁজে পেয়ে এক লক্ষ্যমুখী তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে। ধর্মীয় মুখোশ পরে সেই পুরনো কায়দায় ফ্যাসিষ্ট-শক্তি নির্ভরতায় আঘাত হানছে—সংবাদপত্রে, পুড়িয়ে দিচ্ছে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। 'গণতান্ত্রিক সুযোগ' নিয়ে আর 'গণতান্ত্রিক' সরকারের তৈরি ইস্যুকে সম্বল করে তারা হরতাল করেছে। হরতালের মধ্যে দিয়ে তারা হীন-রাজনৈতিক লক্ষ্য বাস্তবায়নে রাজপথ দখল করতে উদ্যত হয়েছে। অত্যন্ত কু-কৌশলে তারা সরকারি ইস্যু ও মদদ যেমন কাজে লাগাচ্ছে ঠিক তেমনি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যু নিয়ে প্রধান বিরোধী দলের ছত্রছায়ায় থেকে এক জঘন্য-কৌশলে সংসদীয় ভুমিকা পালন করে নিজেদের শক্তিকে সংহত করছে। তারা যদি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ইস্যুকে গুরুত্ব দিত, তা হলে সরকারি উৎসাহে সৃষ্ট গৌণ ইস্যুকে তারা গুরুত্ব দিয়ে রাজপথ দখলের পাঁয়তারা করে মানুষের দৃষ্টিকে অন্যদিকে সরানোর কৌশলে ব্যতিব্যস্ত হত না। আসলে জামাত যে কোন অছিলায় সংসদ ও রাজপথ দখল করে শক্তি সঞ্চয় করতে চায়; যে শক্তিতে আর ফ্যসিষ্ট মনোবৃত্তিতে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত হওয়ার বেদনা পুষিয়ে নিয়ে সর্বগ্রাসী আঘাত হানতে চায়। এই অপকৌশলের কাছে প্রধান বিরোধী দল পিছিয়ে পড়ছে বলে মনে হয়।

সাধারণ মানুষ চায় না যে প্রধান বিরোধী দল জামাতের সঙ্গে যে কোন পর্যায়ে সম্পর্কিত হোক। এতে সাধারণ মানুষ প্রধান বিরোধী দলের প্রতি আস্থা হারাবে। জামাতকে বিএনপি যতটুকু কাছে পেয়েছে, ততটুকু বিরোধী দল কাছে কখনো পাবে না। যদি একান্তভাবে তাদের কাছে টানা হয়, তবে মুক্তিযুদ্ধের মূলধারার মূল দল বলে গৌরবের চিহ্ন দিন দিন ম্লান হয়ে পড়বে। এমনই কথা শুনতে হয় যে, বিএনরি সঙ্গে জামাতের আঁতাত হলে দোষের হয় না, প্রধান বিরোধী দলের হয়। তা-তো হবেই, প্রধান বিরোধী দল হল মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদানকারী দল। যে দল মুক্তিযুদ্ধের প্রধান শত্রু দল জামাতকে কখনো আশ্রয় দিতে পারে না। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য মুক্তিযুদ্ধের দেশপ্রেমিক দলগুলোকে শায়েস্তা করার জন্যে বা মাথা উঁচু করে না দাঁড়াতে পারে তার জন্যে; জামাত ও স্বাধীনতা বিরোধী শক্তিদের সমর্থনে মোশতাকচক্র, প্রেসিডেন্ট জিয়া, এরশাদ ও অন্যান্য সামরিক শক্তি বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

আওয়ামী লীগ সংগঠনগতভাবে পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে আজ যখন সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী ও সংগঠিত; তখন কেন গণধিকৃত পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ের শত্রু ও মুক্তিযুদ্ধের চিরশত্রু জামাতের ছায়াকে গ্রহণ করছে; তা সাধারণ মানুষের চোখে অন্যভাবেই ধরা দেয়।

মানুষ যখন মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সংহত হয়ে ভোটযুদ্ধে জিতে, সামাজিকভাবে

জিতে, রাজপথে জিতে—মুক্তিযুদ্ধের চিরশত্রু জামাতসহ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে উৎখাত করার জন্যে উদ্যত, তখন জামাতের সঙ্গে সখ্য মোটেই কাম্য নয়। মুক্তিযুদ্ধ হাজার বছরের ইতিহাসে সবচাইতে গৌরবের, সবচাইতে ত্যাগের, সবচাইতে আবেগের, সবচাইতে বড় স্বপ্নের; সেই নিরিখে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সখ্য-সম্পর্ক শুধুমাত্র সংসদীয় কৌশলের নামে হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধের শত্রু, মুক্তিযুদ্ধের মিত্র, মুক্তিযুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা সর্বাগ্রে স্থান পাওয়া উচিত; তা-না হলে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বাঁচানো যাবে না, বাঁচানো যাবে না মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধুর ভূমিকা, বাঁচানো যাবে না লক্ষ লক্ষ শহীদের মর্যাদা আর গৌরব। বাঁচানো যাবে না শহীদ জননীর গৌরবময় ভূমিকায় উৎসারিত মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়ে ওঠা সংহত স্পর্ধাকে। ❑

২৫ আষাঢ় ১৪০১

কবিদের মঞ্চ, কিছু বিবেচনা

গত ৮ কার্তিক ভোরের কাগজ-এ 'শামসুর রাহমানের জন্মদিনে, কিছু কথা' শীর্ষক কবি নির্মলেন্দু গুণের লেখা মুক্তচিন্তায় প্রকাশিত হয়েছিল। লেখাটি পড়ে আমার তাৎক্ষণিক কিছু প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। ভেবেছিলাম, প্রতিক্রিয়াটি নিজের মধ্যেই রেখে দেই কিন্তু না,তা যেন বার বার আমাকে বেশ অনুরণিত করছিল, সে কারণে লেখাটি প্রকাশিত হওয়ার কিছুদিন পর লেখাটি সম্পর্কে আমার কিছু ব্যক্তিগত বিবেচনা তুলে ধরতে চাই।

নির্মলেন্দু গুণ আমার একজন প্রিয় কবি, তাঁর লেখা আমি সবসময়ে মনোযোগসহকারে পড়ে থাকি। বলা চলে আমি তাঁর একজন উৎসাহী পাঠক। কবি শামসুর রাহমানের জন্মদিন উপলক্ষ্যে উল্লিখিত লেখাটি লিখতে গিয়ে কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর জন্মদিন নিয়ে 'উল্লেখযোগ্য স্মৃতি' নেই বলে এক ধরনের সুক্ষ্ম কাতরতা প্রকাশ করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'আমার জন্মদিন নিয়ে মানুষের বিব্রত না হওয়ার সময় এখনো আসেনি।' কিন্তু এই লেখাটি প্রকাশের কদিন পরেই কবি নির্মলেন্দু গুণের পঞ্চাশতম জন্মদিন পালন হলো আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে দিয়ে, বেশ একটি সুন্দর আয়োজনে। তিনি লিখেছেন, 'কবি শামসুর রাহমানের পঞ্চাশতম জন্মদিনে তার অনুরাগী ভক্ত পাঠকরা কবির দিক থেকে ইঙ্গিতের (কবিগুরু পর্যন্ত জন্মদিন পালনের ব্যাপারে ভক্তদের ইঙ্গিত দিতেন বলে রবীন্দ্র সান্নিধ্যধন্য শৈলজারঞ্জন মজুমদার আমাদের জানিয়েছেন) অপেক্ষায় না থেকেই বাংলা একাডেমীর বটতলায় একটি চমৎকার নাগরিক সংবর্ধনা সন্ধ্যার আয়োজন করেছিল।' কবি শামসুর রাহমান তাঁর কাব্যকৃতির জন্য এবং তাঁর জন্মদিন পাঠক-ভক্তদের কাছে উল্লেখযোগ্য জন্মদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল বলেই হয়তো একজন কবির পঞ্চাশতম জন্মদিন গ্রহণীয় ও বরণীয় হয়েছিল। এতে কবি শামসুর রাহমানের মর্যাদা যেমন বেড়েছিল, তেমনি কবিদের প্রতি পাঠক-সাধারণের যে আত্মিক-সম্পর্ক, তাও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল।

কবি নির্মলেন্দু গুণের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই বলছি, তার পঞ্চাশতম জন্মদিন পালন করা কবিদের জন্মদিন পালন করার রেওয়াজে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাঁর এ দীর্ঘ কাব্যফসল- উৎপাদনমুখর-জীবনে একজন একনিষ্ঠ চাষীর মতো গৌরবময় ভূমিকা তিনি রেখেছেন, সেজন্য তার প্রতি অগণিত পাঠকের আকর্ষণ- শ্রদ্ধা-

মমতা বেশ গভীর ভাবেই আছে বলে আমার মনে হয়। সে ক্ষেত্রে কবির কাছে কবির জন্মদিন বিশেষ করে একজন গুরুত্বপূর্ণ কবির পঞ্চাশতম জন্মদিন আনুষ্ঠানিকতার ছোঁয়ায় পাঠক-ভক্তদের সম্মিলনে কাঙ্ক্ষিত হতেই পারে। কবি নির্মলেন্দু গুণের সেই গুপ্ত-সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা যদি খানিক উন্মুখ হয়, তা দোষের নয় বলে আমি মনে করি।

একজন কবির বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠক থাকতে পারে, আবার একজন পাঠকের প্রিয় বিভিন্ন কবি বা কবিতা থাকতে পারে। কবি ও পাঠকের সেতুবন্ধনে কবিতার সার্থকতা সংহত হয়, সমৃদ্ধ হয়। কবিতার রস উপভোগ করে পাঠক তাঁর বিভিন্নমুখী কারণে, সে কারণ রুচি-দর্শন-শিক্ষা-আবেগ-জীবনদৃষ্টিভঙ্গী ইত্যাদির ওপর গড়ে ওঠে। পাঠকের স্বাধীনতা রয়েছে কবিতা গ্রহণ ও বর্জনে। কবিরও স্বাধীনতা রয়েছে কবিতা রচনার ক্ষেত্রে, কি ধরনের বিষয়বস্তু হবে, কি ধরনের শিল্পশর্ত পূরণ করা হবে, তা কবির একান্ত বিবেচনা থেকে উৎসারিত হয়ে থাকে। কবি ও পাঠকের স্ব-স্ব স্বাধীনতা থাকলেও তাঁরা এক ধরনের ঐক্যভূমি স্পর্শ করে সম্পর্ক বজায় রাখে। এই ঐক্যভূমির উজ্জ্বলতার ওপর কবিতার সার্থকতা অনেক ক্ষেত্রে নির্ভর করে। কোনো পাঠক যদি বঙ্গবন্ধুর ওপর সার্থক কবিতা লেখার জন্য কবি নির্মলেন্দু গুণকে গুরুত্ব দেয়, তাঁর কবিতাকে কাছে টানে, সেটা কবির জন্য কি গৌরবের নয়? অবশ্যই গৌরবের। পাঠক তাঁর স্বাধীনতার ভিত্তিতে কবিতা ও কবিকে নির্বাচন করতেই পারে । এ দৃষ্টিতে আমি মনে করি পাঠকদের দিক থেকে কবিতার এক ধরনের মূল্যমান আছে, পাঠকের শ্রেণী-বিভাজনের কথাটা মনে রেখেই তা বলছি। তাই যখন 'বঙ্গবন্ধুর কবি নির্মলেন্দু গুণকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা' জানান আওয়ামী লীগের নেত্রী সাজেদা চৌধুরী, তখন তা দোষের হয় না বলেই মনে করি। কবি ও কবিতাকে কোনোভাবে ছোঁয়া যাবে না বলে অনেকে মনে করতে পারেন, তা আমি মনে করি না।

নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন, 'কবিত্বশক্তি হচ্ছে এমন এক মহামূল্যবান বস্তু, অর্থ-বিত্ত, অধ্যয়ন বা অধ্যবসায় দ্বারা যা অর্জন করা যায় না।' কবিত্বশক্তি কি, তা তিনি ব্যাখ্যা করেন নি। কবিত্বশক্তি ব্যাখ্যার একেবারে অতীত? তা আমি মনে করি না। মানুষের অনেক শক্তিকেই ব্যাখ্যা করা যায়। সেখানে শুধুমাত্র কবিত্বশক্তিকে এক ধরনের ব্যাখ্যার অতীত ভেবে বিবেচনার বাইরে রেখে তথাকথিত আধ্যাত্মদোষে সম্পর্কিত করা ঠিক নয়। কবিত্বশক্তি অনেক উপাদানে; দ্বন্দ্বে-ইচ্ছেয়-শিক্ষায়-রুচিতে-আকাঙ্ক্ষায়-সামাজিক অবস্থানের টানাপোড়নে- আবেগে-মস্তিষ্কের শক্তিতে-মেধায় ও ইত্যাদিতে ভিত্তিময়। সেখানে অধ্যয়ন-অধ্যবসায় কম মূল্যবান নয়। বিভিন্ন সূক্ষ্ম ও মোটা দাগের উপাদান এই কবিত্বশক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত থেকেই যায়।

কাব্য ও কবির বিচারে অনেক সময়ে সংকীর্ণ রাজনৈতিক ভেদবুদ্ধির পরিচয় আমরা দেই। উদারতা আমাদের মধ্যে থাকে না। বড্ডবেশি মনগড়া মাপকাঠিতে বিচার-বিবেচনা করি বলেই কবি ও কবিতার ক্ষতি হয়ে থাকে। সেটা আমিও মানি, তাই বলে উদাসীন-উদারতায় সবকিছু দেখবো, তা হয় না। উদাসীন-উদারতার ফলে আমাদের জাতীয় জীবনের অনেক অর্জিত ফসল ইঁদুরে খেয়েছে, হিংস্র প্রাণীর নখর-নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। আমরা রক্ত দেবো, সংগ্রামে বিজয়ী হবো, আর বিজয়ী হওয়ার পর, পরাজিত শত্রুদের উষ্ণতায় কাছে টানবো, তা হয় না। এই অকেজো দর্শন আমাদের বার বার বিভ্রান্তির জটাজালে ফেলেছে, পরাজয়ের দিকে টেনে নিয়েছে।

বাংলাদেশে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রীয় সময়কাল থেকে এ অবধি রাজনৈতিক-সামাজিক-মুক্তিযুদ্ধ + আন্দোলন-সংগ্রামের কণ্ঠলগ্ন হয়ে সাহিত্যের ধারা সম্পর্কিত হয়ে বিবেচিত হয়েছে। এ বিবেচনাকে রহিত করে উন্নাসিকভাবে উদারতায় ভিন্নমেরুর সাহিত্যধারাকে একাকার করা ক্ষতিকর ও আত্মবির্সজনের শামিল বলেই আমি মনে করি।

কবি নির্মুলেন্দু গুণ মিলনের উদারতায় একমঞ্চে আনার জন্য কিছু কবির নাম উল্লেখ করে, বর্জন-চিন্তা রহিত করার জন্য, পুনর্বিবেচনার আহবান জানিয়েছেন। এই পুনর্বিবেচনার বিষয়ে আমার ভিন্নমত রয়েছে। তিনি কবি সৈয়দ আলী আহসান, আল মাহমুদ, ফজল শাহাবুদ্দিন প্রমুখকে একই মঞ্চে টেনে এনে ঐক্য-বন্ধনের প্রস্তাব রেখেছেন। নিজেদের মধ্যে মোটামুটি দর্শনগত মিল আছে, একই ধারায় পথ চলার ঐতিহ্য রয়েছে, বিভিন্ন আন্দোলনে-সংগ্রাম থেকে উত্থিত বিবেচনা প্রায় কাছাকাছি, মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে ভাবনায় ফারাক কম, তাঁদের মধ্যে বিভেদ যদি থাকে বা মঞ্চ পার্থক্য থাকে, তবে তা কমিয়ে আনা যায়। তাতে যুক্তিযুক্ত উদারতা থাকে। যেমন কবি শামসুর রাহমান কবি রফিক আজাদের পঞ্চাশতম জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানাতে তাঁর বাড়িতে যেতে পারেন। কিন্তু কবি শামসুর রাহমান যদি কবি আল মাহমুদের জন্মদিনে জামাত নিয়ন্ত্রিত মগবাজারের কোনো বাসায় গিয়ে শুভেচ্ছা জানান, তা কোন যুক্তিতে আমরা সমর্থন করবো? কবি আল মাহমুদ এখন যে দর্শন ও কাব্য ভাবনার প্রতিভূ, তার বিপরীতে কবি শামসুর রাহমানের অবস্থান; তারপরও যদি দুই মেরুর দুই কবির মিলবিন্যাস হয়, তাহলে কি কবি শামসুর রাহমানকে সাংস্কৃতিক জোটের সভায়, সমন্বয় কমিটির মিছিলে বা তাঁর কবিতায় মানাবে? মানাবে না। আর কবি আল মাহমুদকে বর্তমানে জামাতের কর্মী সভায় মানায়, বাংলা সাহিত্য পরিষদের সভায় মানায়, দৈনিক সংগ্রামে স্বনামে-বেনামে প্রগতিশীল লেখকদের দর্শন বিরোধী রচনায় মানায়।

কবি আল মাহমুদকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ঠেলে দিয়ে কোনো শক্তি বা কবি মহল তার ভিন্ন শিবিরের অবস্থানকে শক্তিশালী করে নি। এক্ষেত্রে কবি আল মাহমুদ স্বয়ং যথেষ্ট। তিনি আজ কাব্য-ভাবনা, দর্শন, ব্যক্তিগত ভূমিকা সচেতন ভাবেই স্থির করেছেন। মঞ্চ প্রক্রিয়ায় কবি আল মাহমুদকে যদি উদার ভাবে গ্রহণ করি, তাহলে বহু বিবেচনাকেই বর্জন করতে হবে। এইসব বর্জনে কবিতা, কবি, মুক্তিযুদ্ধ, দর্শন, বাংলাদেশের বিকশিত সাহিত্যধারা কোনোটাই লাভবান হবে না। তবে হয়তো পাঠক হিসেবে বিচ্ছিন্নভাবে এসব কবিদের বিচ্ছিন্ন কবিতা কেউ কেউ গ্রহণ করতে পারেন, তা হয়তো স্বাভাবিক। তবে অন্যান্য বহুবিধ বিবেচনায় তাদের একমঞ্চে গ্রহণ করা সম্ভব হয় নি, এখনো সম্ভব নয় বলে মনে করি। কবি হলেই হাতে হাত মেলানোর গান গাওয়া ঠিক নয়। একই মঞ্চে যদি মৌলবাদী দৃষ্টিভঙ্গী নির্ভর কবিদের দখল দেই, দেখা যাবে একদিন রাজনৈতিক-সামাজিক-প্রাতিষ্ঠানিক অনেক ক্ষেত্রে মৌলবাদীদের অবস্থান যেমন শক্তিশালী হয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে কবিদের মঞ্চেও তারা শক্তিশালী হবে, দেখা যাবে কবি শামসুর রাহমান ও অন্যান্যরা যারা আধুনিক কবি হয়ে উঠেছেন, তাঁদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং আধুনিক কবিদের মঞ্চ হয়তো এভাবে লুপ্ত হয়ে যাবে।

কবি নির্মলেন্দু গুণ তাঁর লেখার এক অংশে বলেছেন, 'ভাবনার বিরোধ না থাকলে মানুষের মনোজগতের মধ্যে গতি আসবে কোথা থেকে?' এ কথাটি আমিও মানি, আর মানি বলেই অখণ্ড মনন-জগতের নামে ভালোবাসা সবপাত্রে একভাবে ঢালবো, তা যুক্তিপূর্ণ নয়। সর্পকে দংশন উদ্যত অবস্থায় ভালোবাসা কি ঠিক? তাই অনেক সময় ঘৃণাও প্রয়োজনীয় এবং জরুরি। ঘৃণাও ভালোবাসাকে বিপরীত দিক থেকে বাঁচায়; সংরক্ষণ ও বিকশিত করে। কবিতা ও কবির মঞ্চ অতীতে কখনো নিরঙ্কুশভাবে একক ও অভিন্ন হয় নি,ভবিষ্যতেও হবে না। এটাই শ্রেয়। ❑

২২ অগ্রহায়ণ ১৪০১
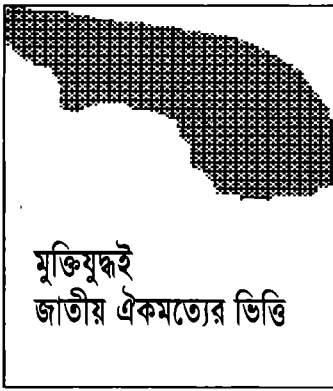
গত ২৬ মার্চ ঐতিহাসিক সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ইতিহাস সৃষ্টি করে মানুষ জমায়েত হল। আগের বিরূপ প্রচারণা, সরকারের কঠোর মনোভাব, সকাল বেলায় পুলিশ টহল আর বাধাবিঘ্ন কিছুই সেই জমায়েত বন্ধ করতে পারে নি। বাঁধভাঙ্গা জোয়ারের মত মানুষ ছুটে এসেছে এই উদ্যানে। এসে তাঁরা জানিয়ে দিল মুক্তিযোদ্ধারা এখনো বেঁচে আছে, এখনো মুক্তিযুদ্ধের উত্তরসুরীরা বেঁচে আছে, এখনো স্বাধীনতার মূল্যবোধে শাণিত বিবেক নিয়ে মানুষেরা বেঁচে আছে, তাঁরা বহুধাবিচ্ছিন্ন নয়, ঐক্য দৃঢ়তায় এখনো শক্তিশালী।

এই বছরের স্বাধীনতা দিবসের সকল অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকতা ম্লান করে দিয়ে ঐতিহাসিক উদ্যানে জনগণ আর একবার ইতিহাস সৃষ্টি করলো। একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির আহবানে এই জমায়েতে মানুষ এসে উপস্থিত হলো এই কারণে, এই আশঙ্কায় যে, একাত্তরের চিহ্নিত বড় পাপী হত্যাকারীর হোতা গোলাম আযম বহু বছর চুপটি থেকে ঘাপটি মেরে একটি দলের প্রধান হয়ে গেল, যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের গৌরব ও শহীদদের প্রতি অবমাননার চরম ধৃষ্টতা। তা আর সহ্য করা যায় না, সহ্যের সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এরফলে এই ফ্যাসিস্ট বলদর্পী কীটেরা হয়তো দংশনে দংশনে গোটা জাতিকেই, মুক্তিযুদ্ধকেই, স্বাধীনতাকেই নিঃশেষ করে ফেলবে। এই আশংকা অমূলক নয়। এই ফ্যাসিস্ট শক্তি স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে গণতন্ত্রের লেবাস পরে অভিনয় করে শক্তি সঞ্চয় করে আঘাত হানার স্পর্ধা লাভ করেছে। এরা সংশোধনতো হয় নি, খানিকটা শক্তি পেয়েই পুরনো চেহারায় হম্বিতম্বি শুরু করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় শত্রু হয়ে যা করেছে, যা বলেছে—তাই আবার শুরু করেছে। এই অবস্থা চলতে থাকলে আর ক'দিন বাদেই তারা হয়তো 'মুক্তিযোদ্ধা নির্মুল কমিটি' তৈরি করে প্রকাশ্যে কাজ শুরু করতো। যার আলামত বিভিন্ন ঘটনায় বিশেষ করে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘটনা থেকেই অনুভব করা যাচ্ছিল। আর এমনি সময়ে জনতা ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতিকে আর একবার নতুন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করলো। আজ আওয়ামী লীগসহ মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক দল, সংগঠন, ব্যক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে যেন নতুন করে মুক্তিযুদ্ধের মর্যাদাকে উর্ধে তুলে ধরেছে। এই ঐকমত্য, এই জাতীয়

সংহতির বাইরে যারা থাকবে তারা যে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি হতে পারে না, তা বলাই বাহুল্য। মুক্তিযুদ্ধের যে সব শক্তি বহুধা বিভক্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলতো, তাদের প্রায় সবাই নতুনভাবে গোলাম আযম, জামায়াত, সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এটা আশার কথা। অন্তত ৩০ লক্ষ শহীদদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নে ও শত্রুর হাত থেকে প্রিয় মাতৃভূমিকে বাঁচানোর জন্য সবাই আজ সংগ্রামে নতুন করে অবতীর্ণ হচ্ছে। জাতি হিসেবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য অন্তত মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে, মুক্তিযুদ্ধের শত্রুদের বিরুদ্ধে ঐকমত্য হওয়া; রাজনৈতিকভাবে ও গণতান্ত্রিক চেতনার দিক থেকেও সঠিক গুরুত্বপুর্ণ। এই ঐকমত্য ও চেতনা না থাকলে আমাদের রক্তে অর্জিত গৌরব ধূলায় পতিত হবে। এর জন্য আমাদের বিবেকের কাছে ও আগামী প্রজন্মের কাছে দায়ী থাকবো। গণতান্ত্রিক পথযাত্রায় জাতীয় বিষয়ে ঐকমত্য জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ। আর এই ঐকমত্যের প্রধান ভিত্তি হোক আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতির গৌরব, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের অমীমাংসিত বিষয়, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগের মহিমা, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের রক্তমাখা অঙ্গীকার, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের সবচাইতে সমৃদ্ধ ইতিহাস, মুক্তিযুদ্ধ আমাদের পূর্বপুরুষের সবচাইতে বড় গৌরবগাঁথা, মুক্তিযুদ্ধ নতুন প্রজন্মের সবচাইতে পথ চলার শক্তিশালী অনুপ্রেরণা, সেই মুক্তিযুদ্ধ হবে জাতীয় জীবনের ঐকমত্যের প্রধান ভিত্তি।

মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত বর্বর মানুষ নামীয় গুটিকতক পশু যারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন, ধর্মের আলখাল্লা পরিহিত মানবতার শত্রু গোলাম আযমীয় বাহিনী হিসেবে চিহ্নিত দুশমন, তারা কখনো ঐকমত্যের ভিত্তি হতে পারে না। হতে পারে না বলেই যারা আজও স্বচ্ছ দৃষ্টিতে বিষয়টি এখনো দেখতে পারেন না, তারা আসলেই মুক্তিযুদ্ধ দেখতে পারেন না। আর পারেন না বলেই জাতিকে ঐকমত্যের ভিত্তিতে দাঁড় করাতে চান না। সেই কারণে বিএনপিও আজ দোদুল্যমানতায় ভুগে ভুগে এখনো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের কাতারে এসে শামিল হয় নি, যখন মুক্তিযুদ্ধের শক্তি ঐক্যবদ্ধ ও সংহত হচ্ছে। বিষয়টি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার কোন সুযোগ নেই, কেননা মুক্তিযুদ্ধ কোন সংকীর্ণ বিষয় নয়। এ বিষয়টি যাদের চোখে স্বচ্ছভাবে ধরা দেয় না, তারা আসলেই অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী। বিএনপি আজ এই ধারায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এই গ্লানি থেকে মুক্তির জন্য বিএনপির মুক্তিযোদ্ধারা কেন চুপ করে আছে, তা বোধগম্য নয়, তারা কি ক্ষমতা ও দলীয় দৃষ্টিতেই মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন?

এতদিন পর মুক্তিযুদ্ধকে প্রধান জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তি করা হচ্ছে কেন? হচ্ছে এজন্যই যে, দিনে দিনে মুক্তিযুদ্ধের শত্রুরা সুযোগ ও সুবিধা পেয়ে, আমাদের

অসতর্কতায় অসচেতনায় ও ঐক্যের অভাবে মুক্তিযুদ্ধকেই এ জাতির বুক থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য হীন তৎপরতায় মেতে উঠেছে। এদেরকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছিল, সেটাই আজ ভুল প্রমাণিত হয়েছে, এরা পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্রীয় গ্যারান্টি পেয়ে পর্দার আড়াল থেকে মাঠে নামার সাহস পেয়েছে, এই সাহস আরো বেড়েছে হীন-কৌশলে, ষড়যন্ত্রে আর ধর্মকে ব্যবহার করে। ক্ষমার সুযোগ নিয়ে মানুষ বিবেকতাড়িত হয়ে অনুশোচনা করে কিন্তু এরা আসলেই এমন দাগী আসামী যারা খুন আর বিশ্বাসঘাতকতা রক্তের মজ্জায় মিশে রেখেছে। এদের হাত থেকে আর একবার পরিত্রাণের জন্যই মুক্তিযুদ্ধকে ভিত্তি করেই ঐক্যবদ্ধ হতে হচ্ছে, না হলে আমাদের সমস্ত অর্জনই এরা নষ্ট করে ফেলবে, এতটা হিংস্র ও সর্বগ্রাসী এরা।

অনেকে বলে থাকে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলে নাকি জাতিকে বিভক্ত করা হচ্ছে। এই কথা যারা বলে তারাই জাতিকে বিভক্ত ও জাতিকে মুক্তিযুদ্ধ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চান। এসব কথা বলে কুটকৌশলে জাতিকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এর আগেও অনেকক্ষেত্রে জাতিকে বিভক্ত করা হয়েছিল, তার জন্য এ জাতিকে অনেক মাশুল দিতে হয়েছে। আজ মানুষ তা বুঝতে পেরে এগিয়ে আসছে। মুক্তিযুদ্ধই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে। মুক্তিযুদ্ধে যেমন করে জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ঠিক সেই ধারায় জাতি আজও ঐক্যবদ্ধ হতে চায়। আমাদের এই প্রধান ঐকমত্যের ভিত্তি নষ্ট করার জন্য বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র, লোভ, সংকীর্ণতা উস্‌কে দেয়ার চেষ্টা করা হবে। সেই পুরনো ভাষায় জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করা হবে, এজন্যে সচেতন থাকতে হবে সব সময়। কখনো এই একটি বিষয়ে আমরা বিভ্রান্ত হবো না, বিচ্ছিন্ন হবো না—এটাই আমাদের চেতনায় টান টান করে রাখতে হবে।

আর ঐকমত্যের বিরুদ্ধে যারা দাঁড়াবে, তারাই হবে আমাদের প্রধান শত্রু, এই বিবেচনা যদি না থাকে তবে আমাদের জাতীয় ঐকমত্য দৃঢ় হবে না। জাতীয় ঐকমত্যের সঙ্গে কোন আপোষ করা চলবে না। যারা এই ঐকমত্যের সঙ্গে ঐক্য ঘোষণা করবে না, তাদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক হতে পার না। এই দৃষ্টিভঙ্গি দৃঢ় করতে হবে, না হলে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তি দৃঢ় হবে না।

আমরা গণতন্ত্র বলি, দেশের অর্থনৈতিক মুক্তি বলি বা সংস্কৃতির স্বাধীনতাই বলি তার জন্য চাই ঐকমত্য ভিত্তিক একই চেতনা। এই চেতনার অভাবের কারণে স্বাধীনতার পর আমরা জাতি হিসেবে শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াতে পারি নি। আজ এসেছে জাতীয় ঐকমত্যের ভিত্তিতে দাঁড় হবার সম্ভাবনা। আমাদের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে যে চেতনার উন্মিলন ঘটেছে, সেই চেতনাকে ভিত্তি করে ২৬ মার্চ গণআদালতের নামে মানুষ জেগেছে সোহরাওয়ার্দী

মাঠে, আজ সারাদেশে মানুষ জেগে উঠছে। এই জাগরণের জন্য আমাদের অভিন্ন এই ঐকমত্যই প্রধান পরিপূরক ভূমিকা পালন করছে। এই ঐকমত্যের চেতনাকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে অভিন্ন ভাবে সর্বসময়ে প্রবহমান রাখতে হবে। এই প্রবহমান ধারায় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শত্রুরা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর এর ফলেই মুক্তিযুদ্ধের ধারায় এই দেশ নতুন সম্ভাবনার মুখোমুখি হবে—যে সম্ভাবনা মুক্তিযুদ্ধে মানুষ দেখেছিল। ❑

৯ বৈশাখ ১৩৯৯
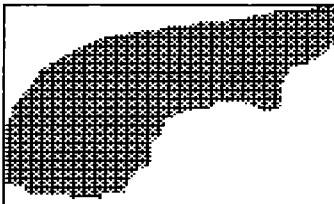
মহাসম্মেলনের চুম্বকশক্তি ও পরীক্ষার ফলাফল

ড: কামাল হোসেনের নেতৃত্বের ধারায় বাংলাদেশের রাজনীতির একরূপবিন্যাস আমাদের চোখে ধরা পড়েছে। ১২, ১৩ ও ১৪ ভাদ্র মহাসম্মেলনের মাধ্যমে বহুদিনের প্রস্তুতিতে গড়ে ওঠা বিশেষ উদ্যোগ বিশেষভাবে রাজনীতিতে কতটুকু ভূমিকা রাখবে, তার একটা পরীক্ষা হয়তো হবে; কিন্তু এই পরীক্ষার ফলাফল এখনই আঁচ করা যাবে কিছু বিবেচনার নিরিখে।

মহাসম্মেলনের আয়োজনকারী যারা, তাঁদের কণ্ঠে বেশ কিছু মোটা দাগের কথা উচ্চকিত হচ্ছে। এসব কথার মধ্যে একটি কথা হল যে, 'মূলধারা'। এই উদ্যোগী পুরুষরা এদেশে 'মূলধারা' সৃষ্টি করবেন। এই মূলধারা কি ধরনের হবে, তা হয়তো মহাসম্মেলনে স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এখনো তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। এই কাঙ্ক্ষিত 'মূলধারা' -এর জলস্রোত এদের নদীতেই বইবে, অন্য কোন রাজনৈতিক দল বা শক্তির নদীতে বইবে না বা বইলেও তা খরায় শুকে যাবে — এ ধরনের আশাবাদ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তাঁদের আশাবাদ সফল হলে আমি নিজেও আশাবাদী হয়ে উঠতাম কিন্তু তা হবে না বলেই মনে হয়।

মূলধারা সৃষ্টি করতে হলে বড় নদী প্রয়োজন, সেই বড় নদীর জলস্রোত গভীরতায় সম্পর্কযুক্ত থাকা চাই। এ ধরনের প্রেক্ষিত সৃষ্টি করতে হলে— পরিপূরক কর্মকাণ্ড, শক্তি, মানুষের সমর্থন ও আদর্শের প্রযোজন। এইসব শর্ত পূরণের জন্যে মহাসম্মেলনের মাধ্যমে প্রথম দিক থেকে যারা জড়িয়ে আছেন, তাঁদের বেশীর ভাগ আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষজন। যাঁদের অনেকে আওয়ামী রাজনীতিতেও অবসর বা নিষ্ক্রিয় তালিকায় উঠে পড়েছিলেন, তাঁরা এমন কি যাদুকরী ভূমিকা রাখবেন, যার ফলে আওয়ামী লীগের বাইরে এসে মূলধারা সৃষ্টি করতে পারবেন, যে ধারা আওয়ামী লীগের চাইতে হবে বেগবান, খরস্রোতা ও শক্তিশালী। কিন্তু তা পারবেন না বলেই মনে হয়। কেননা আওয়ামী লীগ থেকে এ ধরনের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া মানুষের তালিকা দীর্ঘ হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ও ঘটনার প্রেক্ষিতে, সেই তালিকার মানুষজন আওয়ামী লীগের চাইতে উন্নত বা উল্লেখযোগ্য বা কল্যাণকর কোন ভূমিকা রাখতে পারেন নি। বরং তুলনামূলকভাবে ব্যর্থতার গ্লানিমাখা চোরাস্রোতে আটকে পড়েছেন। রাজনীতির ইতিহাস পর্যলোচনা করলে তা চোখে পড়বে। আর তা পড়বে বলেই জনগণও বিভিন্ন প্রশ্ন ও সন্দেহ

নিয়ে মহাসম্মেলনকে বিবেচনা করছে এবং ভবিষ্যৎ উদ্যোগও প্রশ্নে ও সন্দেহে আহত হবে।

দেশের বেশীর ভাগ মানুষের কল্যাণ ও মুক্তির জন্য যে আদর্শ, রাজনীতি ও নেতৃত্ব প্রয়োজন, তা মহাসম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত শ্রেণী- চারিত্র্যের মানুষের কাছ থেকে কি পরিপূর্ণভাবে আশা করা যায়? তা মনে হয় করা যায় না, কেননা এ ধরনের শ্রেণী- চারিত্রের মানুষজনের রাজনীতি ও রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব আরো রয়েছে এদেশে। যদি মূলধারা হয় 'মুক্তিযুদ্ধ'। সেই মুক্তিযুদ্ধের ভাবাবেগ, আদর্শ, ঐতিহ্যকে ধারণ করে সেসব দল রয়েছে— এদেশে, সে সব দলের চেয়ে কি এই উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের ধারাকে বেগবান করতে পারবে? পারবে না। তথাকথিত গণতান্ত্রিক পরিবেশে এঁদের নতুন উদ্যোগে নতুনভাবে ভোটমুখী হাওয়া পালে লাগানোর চেস্টা ব্যর্থ হবে। কেননা ভোটমুখী রাজনীতির যে বৈশিষ্ট্য এদেশের ঐতিহ্য নির্ভরতায় ও অন্যান্য শর্ত সাপেক্ষে বেগবান হয়, তাও তাঁরা অর্জন করতে পারবেন না। তাহলে তাঁদের উদ্যোগ কি রাজনীতিতে কোন প্রভাব ফেলবে না? অবশ্যই ফেলবে, তা ভিন্ন ভাবে যতটুকুই হোক।

মহাসম্মেলনপন্থী উদ্যোগীজনের কেউ বলছেন যে, তাঁরা 'জাতীয় ঐক্য' সৃষ্টি করবেন। 'জাতীয় ঐক্য' কথাটা ব্যাপক ও বিস্তৃত ব্যাখ্যায় উজ্জ্বল হয়। তবে 'জাতীয় ঐক্য' এর আলখাল্লায় আমরা লক্ষ্য করছি যে, মুক্তিযুদ্ধে পরীক্ষিত, পরবর্তীতে মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে পরিচিত বা পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ের আওয়ামী মিত্র শক্তি বা সিপিবিসহ সিপিবি পরিবারভুক্ত শক্তি বা পনের দলীয় অবস্থানে চিহ্নিত শক্তি আজ অনেকটা বিভক্ত হয়ে পড়েছে। এই বিভক্ত শক্তি দুর্বল হয়ে মহাসম্মেলনের মাধ্যমে আরো দুর্বল হয়ে ঐক্য প্রয়াসী হওয়া সত্ত্বেও দুর্বল ভিত্তি রচনা করছে। এই দুর্বল ভিত্তি 'জাতীয় ঐক্য'তো দূরে থাকুক দীর্ঘদিনে গড়ে ওঠে আপন বলয়কেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

সিপিবি নামের শক্তিশালী একটি সংগঠন ভেঙ্গে এক অংশ রূপান্তরিত হতে হতে আর রূপান্তরের ধারায় না থেকে ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে গড়ে ওটা উদ্যোগে একাকার হয়ে পড়েছে। রূপান্তরবাদী সিপিবি'র নেতৃত্বে থাকা অজয় রায়, ডাঃ ওয়াজেদুল ইসলাম, দবিরুল ইসলাম এমপি, মোতাহার উদ্দিন প্রমুখ নেতা ডঃ কামালের নেতৃত্বে আর রূপান্তরিত হতে চান না বলেই ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন।

অন্যদিকে বহুদিন হল জোরালো সাংগঠনিক কর্মকাণ্ড থেকে দূরে থাকা 'ন্যাপ' নামের রাজনৈতিক দলটিও দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পংকজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে জাতীয় কমিটির ৩১ জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে মহাসম্মেলনে সন্মিলনের স্বাদ গ্রহণ করতে

উদ্যোগী হয়েছেন। ন্যাপের সভাপতি অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ জাতীয় কমিটির ২৯ জন সদস্যের সমর্থন নিয়ে মহাসম্মেলনে উপস্থিত হওয়ার বাসনা বাস্পে পরিণত করেছেন। এই পরিবারের সবচাইতে কম শক্তিশালী নতুন গড়ে ওঠা সংগঠন গণতান্ত্রিক পার্টিও মহাসম্মেলনে যোগ দেয়ার প্রশ্নে ভেঙ্গে গিয়ে দুর্বল নেতৃত্ব ও সংগঠনের ভিত্তিকে উন্মুখ করবে মাত্র।

ঐক্য নয়, উল্লিখিত রাজনৈতিক দলগুলোর ভাঙ্গনকে ত্বরান্বিত করে মহাসম্মেলনের চম্বুক শক্তি যে সব দুর্বল শক্তিকে একখানে টেনে আনছে, সেই সব দুর্বল শক্তির সমবেত উত্থানে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় হতে পারবে না বরং মুক্তিযুদ্ধ ও অন্যান্য মৌল বিষয় নিয়ে যে জাতীয় ঐক্য গড়ার সম্ভাবনা তা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। মহা সম্মেলনের মধ্য দিয়ে প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙ্গে যে অবস্থার সৃষ্টি হল, সেই অবস্থায় শক্তির অপচয় অনেক ক্ষেত্রে চিহ্নিত হবে।

মহাসম্মেলনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত আবার কেউ বলেছেন যে, তাঁরা 'তৃতীয় ধারা' সৃষ্টি করবেন। তাঁদের 'তৃতীয় ধারা' কতটুকু শক্তিশালী বা কেমন হবে সে প্রশ্নে বিভিন্ন বিবেচনা স্থগিত রেখে বলা যায় যে, আপতত ভোটের রাজনীতিতে এই 'তৃতীয় ধারায়' বিএনপি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না বরং লাভবান হবে। আওয়ামী লীগ ক্ষতিগ্রস্ত হবে, তা যতটুকুই হোক। আর বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল বামপন্থী, প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক শক্তি সিপিবি, ন্যাপ ও গণতন্ত্রী পার্টি। মহাসম্মেলনের মাধ্যমে যে ক্ষতির ব্যাপকতা বাড়লো, তা পুরোপুরি পুষিয়ে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

গণতান্ত্রিক পরিবেশে গণতান্ত্রিক চর্চায় নতুন সংগঠন করা, গড়া, ভাঙ্গা ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সামিল হওয়া হয়তো দোষের নয় কিন্তু তা যদি মানুষের কল্যাণে লক্ষ্যমুখী না হয়ে কিছু মানুষের খেয়াল, ইচ্ছাপূরণ আর পুরনো বাক্য নির্ভর আহবানে একই বৃত্তে ঘুরপাক খায় – তবে রাজনীতির নামে তা হবে ক্ষীয়মান রেখা মাত্র। এই ক্ষীয়মান রেখায় কল্যাণী ধারা বেগবান হয় না। বেগবান হয় বিপরীত ধারা, যা অকল্যাণকর। ❑

২৯ শ্রাবণ ১৪০০
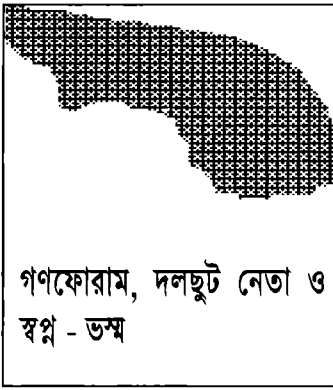
গণফোরাম, দলছুট নেতা ও স্বপ্ন - ভস্ম

গণফোরাম গঠন হওয়ার পর গণভিত্তি পায় নি, বরং গঠন—পর্ব থেকেই গণফোরাম নামক রাজনৈতিক দলটির নেতা-সংগঠকরা একে একে অনেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছেন। অন্যদলে যোগ দিয়ে দলত্যাগীরা ভিন্ন মূর্তিতে মূর্তমান হয়ে উঠেছেন, সেই সাথে গণফোরামের ভাবমূর্তি অনেকাংশে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে, এই ক্ষতি যতি ছাড়া অবস্থায় নিয়ে যাচ্ছে নতুন দলটিকে।

গণফোরাম থেকে চলে গেলেন, শাহাজাহান সিরাজ, এককালের জাসদ নেতা। বিএনপিতে যোগ দিলেন একদল অনুসারী নিয়ে, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বগুণে মুগ্ধ হলেন। গণফোরামের কেন্দ্রীয় কমিটির বেশ ক'জন সহযাত্রী তার সাথে সহগামী হলেন। জানিনে, বিএনপিতে গিয়ে কোন ধারাকে বেগবান করবেন শাজাহান সিরাজ। তবে, গণফোরাম সৃষ্টির সময় শাজাহান সিরাজরা গণফোরামকে রাজনীতির মূলধারা হিসেবে পরিণত করতে এক ধরনের ডগমা সৃষ্টি করে স্বপ্নবিলাসী-আকাঙ্ক্ষার পরিচয় দিয়ে ছিলেন। সেই ডগমা- নির্ভর চেঁচামেচি কমেছে, ইতিমধ্যে সিপিবির এককালীন সাধারণ সম্পাদক নুরুল ইসলাম নাহিদ সমগোত্রীয় দু'জন এমপিকে নিয়ে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। অনেকে অতি উৎসাহী হয়ে গণফোরামের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তাঁদের মানসভূমি স্পর্শ করেছিলেন, যাঁদের অনেকে ছিলেন বুদ্ধিজীবী, প্রাক্তন আমলা, বিভিন্ন সংস্থার বড় কর্তা; তাঁরা নিজেদের সম্পর্কহীন করে এখন গণফোরাম থেকে দূরবর্তী অবস্থানে রয়েছেন। শুধু কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা নয়, জেলা পর্যায়ে গণফোরামের অনেক নেতা- কর্মী স্বপ্নভস্ম নিয়ে অন্যদলে যোগ দিয়েছেন বা বিচ্ছিন্ন হয়েছেন। সিপিবি থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া রূপান্তরের নামে বেশ কিছু নেতা ও কর্মী গণফোরামে যুক্ত হয়েছিলেন, যাঁদের পাল্লা সারাদেশে বেশ ভারী ছিল। তাঁদের অনেকে এখন হতাশায় ভুগছেন, নয়তো নিষ্ক্রিয়, নয়তো রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন, নয়তো ভিন্ন দলের খাতায় নাম লিখেছেন। শোনা যাচ্ছে কেন্দ্রীয় কমিটির আরও নেতা বিভিন্ন দলের লেবেল নিজেদের পোশাকে অচিরেই লাগাবেন।

বিভিন্নদল থেকে আসা বিভিন্নমুখী ব্যক্তির ক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ, লক্ষ্য বিভিন্ন মাত্রায় থাকার পর একই স্বপ্নে বিভোর হয়ে পথ হাঁটতে শুরু করে একই

পথে থাকা সম্ভব নয়, তার নিকট উদাহরণ হিসেবে গণফোরামের বিভিন্ন ব্যক্তি বাস্তবতা দেখালেন। শাহজাহান সিরাজ তার দলের যতটুকু অবশেষ নিয়ে গণফোরামে এসেছিলেন, তার প্রায় সবটুকু নিয়ে তিনি বিএনপিতে অবস্থান নিলেন, তার হাতে অবশ্য কম সংখ্যক অনুসারী ছিল। পংকজ ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে যে অল্প সংখ্যক নেতা ও কর্মী গণফোরামে এসে ন্যাপের নেতৃত্ব ও সাংগঠনিক স্থবিরতা হতে হয়তো বাঁচতে চেয়েছিলেন, তাঁরাও আজ গণফোরামের সাংগঠনিক চঞ্চলতা রহিত অবস্থায় দিশেহারা। ন্যাপ ঘরানার ক্ষুদ্র দল গণতন্ত্রী পার্টি থেকে এসেছিলেন কিছু ত্যাগী নেতা ও কর্মী, তাঁরাও হয়তো গণফোরামের পরিণতি নিয়ে আশঙ্কা করছেন।

সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, শামসুদ্দোহার মত এককালীন তুখোড় সিপিবি নেতা, যারা রূপান্তরের নামে গণফোরামকে সমুদ্র থেকে উৎসারিত মূলধারা হিসেবে রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করার স্বপ্নাবিলাসী ছায়া দেখেছিলেন, তারা হয়তো এখন নিজেদের বাস্তবতাকে অসহায় দৃষ্টিতে দেখছেন। সিপিবি- ন্যাপ- গণতন্ত্রী পার্টির ধারা থেকে আসা ব্যক্তিবর্গই গণফোরামের মূল প্রাণ-স্পন্দন সৃষ্টিতে তৎপর ছিলেন, এখন গণফোরামে যতটুকু প্রাণ-স্পন্দন আছে, তাঁদেরই শক্তিতে। আওয়ামী লীগ থেকে যতটুকু শক্তি ছিনিয়ে নেয়ার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল তা নেয়া সম্ভব হয় নি। নিষ্ক্রিয় ও বিচ্ছিন্ন হওয়া অল্প সংখ্যক আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মী গণফোরামে যুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাও এখন অনেকে পূর্ব দলে জায়গা খুঁজছেন বলে জানা যাচ্ছে। ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম গণফোরামের অন্যতম রূপকার, তিনি এখন গণফোরাম থেকে বিচ্ছিন্ন। আওয়ামী লীগের নেতা ডঃ কামাল হোসেনই একমাত্র গণফোরামের মূল নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন, যার ছায়ায় তাঁর মত ভিন্ন দলের অনেক উল্লেখযোগ্য নেতা একাকার হয়ে ভবিষ্যতমুখী স্বপ্ন-সাধ নিয়ে রাজনীতির নতুন ধারা সৃষ্টিতে পা ফেলতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেই নিরীক্ষা আজ পর্যুদস্ত হয়ে পড়েছে, অনেকাংশে তা ব্যর্থ হয়েছে।

হয়তো অনেকে বলবেন যে, গণফোরামের সামনে আরও সময় আছে; আমিও মনে করি সময় আছে কিন্তু সে সময়ে গণফোরাম আরও শক্তিশালী না হয়ে, যে ধ্বস-প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তাতে নুব্জ হয়ে পড়বে। দল-ছুট নেতারা যেভাবে এসেছিলেন গণফোরামে, ঠিক তেমনিভাবে আবারো ছুটে গিয়ে অন্যদলে উপস্থিত হচ্ছেন। এ প্রক্রিয়া বেশ শক্তিশালী বলেই মনে হয় গণফোরামে, এ প্রক্রিয়া ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হলে আশ্চর্যের কিছু থাকবে না।

একটি উচ্চাভিলাষী বিবেচনায় গণফোরামের গোড়াপত্তন হয়েছিল, যার গোড়ায় ছিলেন ডঃ কামাল হোসেন, যিনি আওয়ামী লীগের শক্তি-সামর্থে যতটুকু

উজ্জ্বল ছিলেন বা নিজের পেশাগত মর্যাদায় যতটুকু সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিলেন, নিজে দল করে সেই উজ্জ্বলতা, সেই গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তি বাড়িয়ে গণফোরামকে গতিশীল করতে পারেন নি। এর একটি বড় কারণ দলছুট লোকদের জনগণ গভীরভাবে গ্রহণ করেন না, বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখীনও হতে হয়। সেইসব কারণ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে উতরে যাওয়া ডঃ কামাল হোসেনের সম্ভব হয় নি। সংগঠন ছাড়া ব্যক্তিগত পেশায় ও বিদেশ সফরে তিনি সময় বেশি দেন, পরিসংখ্যানে তা জানা যায়। এই অবস্থায় একজন শক্তিশালী নেতা হিসেবে তিনি গণফোরামকে কতটুকু জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারবেন, তা সহজে অনুমেয়।

যেসব দলছুট নেতারা বর্তমান গণফোরামে রয়েছেন, তারা যে গণফোরামকে বিস্তৃত ও গতিশীল করবেন, সেই রকম সম্ভাবনা কম। এমনিতে এসব নেতা বেশ আশা নিয়ে বক্তৃতার ভাষা তৈরি করে তাঁদের পূর্বের আদর্শকে এমনভাবে বাতিল করেছেন, তাতে তাঁদের পুরনো আদর্শের শত্রুরাও মুচকি হেসে পরবর্তীতে হায় হায় করেছেন। এক ধরনের নাটকীয়তা এনে অমূলক, কাল্পনিক, অযৌক্তিক, মিথ্যা ও আকাশ কুসুম ভাবনা দিয়ে তাঁরা যেন ঘোড়ায় চড়ে বেশ গতিতে সামনে এগিয়ে যেতে চেয়েছেন। কিন্তু তাঁরা ভূতগ্রস্ত হয়ে ঘোড়ায় চড়ে ছিলেন বলেই হুমড়ি খেয়ে পড়েছেন। এঁদের দশা দেখে মনে হয়, এঁরাও গণফোরামকে শক্তিশালী করতে পারবেন না। তাহলে গণফোরাম কি একটি নিরীক্ষা হিসেবে দিন দিন ব্যর্থ হবে? গণফোরামের জড়ত্ব, থিতিয়ে পড়া ও অন্যান্য বিবেচনা থেকে তাই মনে হয়। ব্যর্থতার গ্লানি জুটবে গণফোরামের সংশ্লিষ্ট নেতাদের ঝুলিতে।

গণফোরাম সৃষ্টির প্রাক্কালে কিছু বুদ্ধিজীবী, কিছু তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর লোকজন ভেবেছিলেন যে, গণফোরামের মাধ্যমে নতুন এক ধরনের রাজনৈতিক চর্চা শুরু হবে, রাজনীতিতে আলোড়ন-বিলোড়ন হবে, কিন্তু তাও হয় নি। তাঁরাও হতাশ হয়েছেন। স্বপ্ন ছিল কিন্তু বাস্তবতা ছোঁয়ানো যায় নি।

গণফোরামের কারণে সবচেয়ে বেশী ক্ষতি হয়েছে, গণতান্ত্রিক- বামপন্থী- প্রগতিশীল- শক্তি সিপিবি,ন্যাপ ও গণতন্ত্রী পার্টির। ক্ষতির বিপরীতে গণফোরাম নিজের অবস্থানকে শক্তিশালী করতে পারে নি। 'তৃতীয় ধারা' সৃষ্টির নামে যারা গণফোরামে এসেছিল, তাঁদের কিছু নেতা-কর্মী বিএনপিতে গিয়ে হাজির হয়েছেন, আর আওয়ামী লীগ থেকে যতজন এসেছিল, তার চেয়ে বেশীজন গণফোরাম থেকে আওয়ামী লীগে যোগ দিয়েছেন। ভাঙ্গা গড়ার প্রক্রিয়ায় গণফোরাম বর্তমানে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে কাতরাচ্ছে।

গণফোরাম ঃ না নেতার নেতৃত্ব, না সাংগঠনিক প্রক্রিয়া জোরদার, না আদর্শ,

না বিকল্প রাজনীতি, না দলছুট নেতাদের ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা, না জনগণ নন্দিত গ্রহণযোগ্যতা; কোনোটাই গভীর ভিত্তির ওপর দাঁড়ায় নি। ভবিষ্যতে গণফোরামের ভিত্তি আগের চেয়ে শক্তিশালী বা দুর্বল হবে তা হয়তো আমরা অনেকে পর্যবেক্ষণ করবো। কিন্তু বর্তমানে গণফোরাম আগের চেয়ে অনেক বেশি গতিহীন হয়ে পড়েছে, এ অবস্থায় গনফোরামের পতাকাতলে অনড় – অটল আর থিতু হয়ে থাকা অনেকের পক্ষে সম্ভব নয়। এ অবস্থায় গণফোরাম ভবিষ্যতের বাউরী-বাতাসে মাটি থেকে শিকড়-বিচ্ছিন্ন হওয়া উদ্ভিদের মত মুখ থুবড়ে পড়ে অসহায় হয়ে যেতে পারে। ❑

২০ পৌষ ১৪০১

সিপিবি'র সঙ্কট ও কিছু বিবেচনাবোধ

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) কি ভেঙে যাবে? এ নিয়ে রাজনৈতিক মহলে, সিপিবি'র কর্মীদের মধ্যে, সিপিবি'র শুভানুধ্যায়ীদের মধ্যে জল্পনা-কল্পনা শুধুই চলছে না, এক ধরনের আশঙ্কাবোধ বাস্তবতা ছুঁয়েছে। সিপিবি যদি ভাঙে, দল হিসেবে বিভাজন প্রক্রিয়ায় খণ্ড খণ্ড হয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে, তাহলে এদেশের গৌরবময় ইতিহাসের একটি ধারা আরও আঁধারে ক্ষীয়মান-রেখায় পতিত হবে, যা এদেশের শোষণ-বঞ্চনা বিরোধী আন্দোলনের জন্যে এক দুঃখজনক পরিণতিকে পরিপূর্ণ করে তুলবে মাত্র।

গত ১৪, ১৫ ও ১৬ ফাল্গুন সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পার্টির নাম, কাঠামো ও রূপান্তরের প্রস্তাবের পক্ষে পার্টির সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ ১৫ জন সদস্যের প্রেসিডিয়ামের ১১ জনসহ কেন্দ্রীয় কমিটির ৪০ জন সদস্য সমর্থন দিয়েছেন। এবং এর বিপরীতে কমিউনিস্ট পার্টির নাম অপরিবর্তিত রেখে ভিন্ন প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছেন ১৩ জন। আগামী ৩১ বৈশাখ, ১ ও ২ জ্যৈষ্ঠ সিপিবি'র বিশেষ জাতীয় সম্মেলন ডাকা হয়েছে। এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সিপিবি'র সঙ্কট যে বেশ গভীর, তা স্বাভাবিক বিবেচনায় উপলব্ধি করা যায়।

সিপিবি'র এ ধরনের সংকট এর আগে বিশেষ করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর এভাবে কখনো দেখা যায় নি। সিপিবি'র নিজের ঘরে নিজেদের মধ্যে এই যে সঙ্কট তা এমনভাবে প্রকট হয়েছে, তা থেকে উত্তরণের জন্যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা বেশ জটিল হয়ে পড়েছে। জটিলতা কাটবে নাকি এই জটিলতায় সিপিবি আরও আষ্টেপৃষ্ঠে পড়বে; তা ভবিষ্যতের উদ্যোগ, প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে পরিষ্কার হবে। সেটা ভিন্ন বিবেচনা।

সিপিবির নাম পরিবর্তনের যে প্রস্তাব এসেছে, সে প্রস্তাবটি আসলে সাম্প্রতিক কমিউনিস্ট দেশসমূহের রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তন ও বিভিন্ন বিপর্যয়ের কারণে প্রভাবিত হয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্যে কেউ কেউ প্রেষণা অনুভব করছেন। এই প্রেষণা কতটুকু আবেগতাড়িত, কতটুকু যুক্তিযুক্ত, কতটুকু গভীর উপলব্ধিজাত তা পুনর্বিবেচনা করা প্রয়োজন বলেই মনে হয়।

পাকিস্তান আমলে অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার কারণে, পার্টি বেআইনী থাকার

কারণে, বিরূপ প্রচারের কারণে, শাসকগোষ্ঠীর অগণতান্ত্রিকতার কারণে – কমিউনিস্ট নাম নিয়ে কাজ করা ছিল দুরূহ। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার মধ্যে দিয়ে গৌরবময় ভূমিকার কারণে কমিউনিস্ট পার্টির গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। স্বাধীনতার পর নতুন রাজনৈতিক পরিবেশে নতুনভাবে কমিউনিস্ট পার্ট অর্থাৎ সিপিবি গড়ে উঠতে থাকে। তখন দেশের বিভিন্ন এলাকায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজ করা অনেকটা সহজ হলেও কমিউনিস্ট নামের ক্ষেত্রে সংকোচ, পুরনো বিরূপ প্রচারের ফলে গড়ে ওঠা সামাজিক স্পর্শকাতরতায় কারণে সিপিবি'র সাংগঠনিক প্রক্রিয়া এগিয়ে নিয়ে যাওয়া অনেক ক্ষেত্রে সহজ হয় নি। কিন্তু সিপিবি প্রকাশ্য কাজ করার অধিকার পেয়ে তার সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ও নিবেদিত কর্মী -নেতাদের অবদানের কারণে কমিউনিস্ট নামের পুরনো বিরূপতা কাটতে থাকে। মনে পড়ে স্বাধীনতার পর গাইবান্ধা মহকুমা কমিউনিস্ট পার্টির অফিস শহরের ডিবি রোডে যখন খোলা হয়, সে সময়ে প্রথমদিকে পর্দা লাগিয়ে কার্যালয়ের কাজ চলে। ছাত্র ইউনিয়নসহ ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মীরা এ কার্যালয়ে ঢুকতে সে সময়ে এক ধরনের সংকোচবোধ করতো। কিন্তু আস্তে আস্তে এ সংকোচ কেটে যায়। এধরনের সংকোচ কাটতে কাটতে সিপিবি দেশের বিভিন্ন এলাকায় শাখা গড়ে তোলে। বিভিন্ন এলাকায় নিজস্ব ব্যানারে সভা সমাবেশ অনুষ্ঠিত করে, ঢাকায় স্বাধীনতার পরপরই সিপিবি'র উদ্যোগে বড় বড় সমাবেশ- মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। সিপিবি কমিউনিস্ট নামেই পরবর্তীতে বহু সদস্য নিয়ে বাংলাদেশের বৃহৎ কমিউনিস্ট পার্টিতে বিকশিত হয়। এভাবে কমিউনিস্ট নামের বিরূপতা অনেকাংশে কেটে যায়। সেই সাথে রাজনীতির ক্ষেত্রে, গণতান্ত্রিক আন্দোলনে, জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কমিউনিস্ট পার্টির গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। সেই কমিউনিস্ট পার্টির নাম বদলানো কি এখন জরুরী হয়ে পড়েছে? বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা এখন নেই, কমিউনিস্ট নামে সামাজিক অগ্রহণযোগ্যতাও আগের মত নেই, তবে কেন কমিউনিস্ট নাম বাতিলের উদ্যোগ বিবেচিত হচ্ছে? কমিউনিস্ট নামের গ্রহণযোগ্যতা সাংগঠনিক প্রক্রিয়ায়, আন্দোলনে, কৌশলে ও জনগণের কাছাকাছি যাওয়ার ক্ষেত্রে নির্ভরশীল। কমিউনিস্ট নাম বাতিল করলেই গ্রহণযোগ্যতা বাড়বে বা দলের বিকাশ শনৈঃ শনৈঃ করে বাড়বে তা কিন্তু নয়। কমিউনিস্ট পার্টির বিকাশের জন্যে অন্যান্য বিবেচনা গ্রহণ করতে হবে, এসব বিবেচনা সাংগঠনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষভাবে সম্পর্কযুক্ত। কমিউনিস্ট পার্টির নাম ও বৈশিষ্ট্য ক্ষুণ্ন করে তা সম্ভব নয়।

কমিউনিস্ট পার্টির বৈশিষ্ট্য নষ্ট করে কমিউনিস্ট পার্টির নাম বদলিয়ে যারা

বিশেষ ধারা সৃষ্টি করতে চান, তাঁরা কি অন্য দলে নিজেদের অবস্থান টেনে নিয়ে যেতে চান নাকি আলাদা দলের গোড়াপত্তন করে নিজেদের অবস্থান প্রকাশ্যে তুলে ধরতে চান? কমিউনিস্ট পার্টির বাইরে গিয়ে বাজার অর্থনীতি ও প্রচলিত বিভিন্ন ডগমার বশ্যতা স্বীকার করে যারা অন্যদল করে অন্য ধারা সৃষ্টি করতে চান, তাঁরা তাঁদের ধারায় এক বর্ষা-মৌসুমে হয়তো খানিকটা পানি পাবেন। অন্য কোন সময়ে পানি পাওয়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে হয়। আর যারা অন্য দলে গিয়ে জনসেবা নিজের সেবা একাকার করে হাফ ছেড়ে বাঁচতে চান, তাঁরা এক ধরনের করুণার জলে শীতল হতে পারেন।

সিপিবি কমিউনিস্ট বৈশিষ্ট্যে বাঁচলেই তার ঐতিহ্যে, তার বিকাশে, তার সম্ভাবনায় বাঁচবে, নইলে বাঁচবে না। কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে সিপিবি-র বিকাশ ঘটলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, জনগণের আন্দোলন, স্বাধীনতাবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলনও বিকশিত হবে। এসব কারণে দেশপ্রেমিক শক্তি ও দল কখনো সিপিবি'র ভাঙনে উৎসাহিত হতে পারে না। তৃতীয় বিশ্বের গরীব দেশ হিসেবে বাংলাদেশে নানা সঙ্কট সমাধান ও জনজীবনের চাহিদা মিটানোর প্রয়োজনে একটি কমিউনিস্ট পার্টি পরিপূরকভাবে অনেক ভূমিকা পালন করতে পারে। সে কারণে কোন দেশপ্রেমিক দল সেটা বড় বা ছোট হোক–কমিউনিস্ট পার্টিকে দূর-আত্মীয় ভেবে বিচ্ছিন্ন করার উৎসাহ থেকে তাদের বিরত থাকা প্রয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়–পঁচাত্তরের পর মুক্তিযুদ্ধের শক্তিরা যখন বিরূপ প্রতিকূলতায়, সাংগঠনিক দুর্বলতায়, পথ চলার দোদুল্যমানতায় শক্তি ও সাহস অনেকক্ষেত্রে দেখাতে পারে নি, তখন সিপিবি অনেক অসাধ্য সাধন করে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে, সেটা কম গৌরবের নয়। স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনে সিপিবি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সিপিবি যে ভুল করে নি, তা বলবো না। স্বাধীনতার পর থেকে অনেক বামপন্থী, মুক্তিযুদ্ধের শক্তিও ভুল করেছে। সে ব্যাখ্যা আরও বিস্তৃত হতে পারে।

ক'দিন আগে ইজরায়েলে কমিউনিস্ট পার্টির ৪০তম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হল; কমিউনিস্ট নাম উর্দ্ধে তুলে ধরে। গত ৪ঠা মাঘ জর্দান কমিউনিস্ট পার্টি ৪০ বছর পর সে দেশে বৈধতা পেল, তারা কমিউনিস্ট পার্টির মর্যাদা ও আদর্শ উর্ধে তুলে ধরে কাজ করার সংকল্প ব্যক্ত করেছে। দেশের পাশেই পশ্চিমবঙ্গে ও ভারতে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পথ চলা থেকে দূরে সরে যায় নি। রাশিয়ায় কমিউনিস্ট পার্টি কমিউনিস্ট সরকারের বিপর্যয়ের পর আবার জনগণকে নিয়ে আন্দোলিত ভূমিকা পালন করছে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি হিসেবে সিপিবি তার কমিউনিস্ট নাম

বদলাবে কেন? তার বৈশিষ্ট্য অনেকাংশে ধূলোয় ঝেড়ে ফেলে দেবে কেন? এ দেশে ও সারাবিশ্বে কমিউনিস্ট পার্টি মানবতার বিকাশে কি কোন ভূমিকা রাখে নি, সে ভূমিকা কি এখন একেবারে তাৎপর্যহীন হয়ে উঠেছে? এসব বিবেচনার মধ্যে দিয়ে সরলরৈখিক ও প্রাথমিকভাবেই বলা যায় – বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রেখে সাংগঠনিক ভূমিকায় দৃঢ়চিত্তে দৃঢ় পা'য়ে এগিয়ে গেলে যেমন তার সঙ্কট থেকে বাঁচবে, তেমনি এদেশের জনগণও তাঁদের সঙ্কট থেকে বাঁচবার পথ খুঁজে পাবে। জনগণের পথ ও সিপিবি'র পথ একাকার হয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠুক – এ কামনাটুকু দোষের নয় বলেই মনে করি। ❑

২৯ শ্রাবণ ১৪০০

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) ভাংগন প্রক্রিয়ার বিভক্ত হয়ে পড়লো – অবশেষে। এই বিভক্তি অনেকের মনোব্যথা সৃষ্টি করেছে। বিশেষত সিপিবি'র সদস্য, কর্মী, সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ী অনেকে এই ভাংগন প্রচেষ্টাকে সমর্থন না করলেও – সিপিবি দুই ভূভাগে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর এখন কেমন ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে; সেটা লক্ষ্য করার বিষয়, বিবেচনার বিষয়। বেশ কিছুদিন হলো সিপিবি'র কর্মকাণ্ড দলকে ভাঙবার জন্যেই যেন সীমাবদ্ধ ছিল। সে অবস্থায় এই দল এগিয়ে যাওয়ার স্পর্ধা, সাহস ও শক্তি ক্রমান্বয়ে হারিয়ে একটা বৃত্তে আটকে গিয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। এর জন্য কেন্দ্রীয়-নেতৃত্ব বেশি দায়ী ছিল কিনা, তা প্রশ্ন জাগায়।

৪৫ বছরের ঐতিহ্যবাহী কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙ্গে পড়ায় বাংলাদেশের গণমানুষের স্বাধিকার, শোষণমুক্ত আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্ত যে হয়েছে – তা যতটুকুই হোক না কেন। আর এই ক্ষতি পুষিয়ে বর্তমানের দু-ধারায় বহমান সিপিবি কতটুকু ভূমিকা রাখবে তা দেখার বিষয়।

সিপিবি তার দীর্ঘ পথযাত্রায় শুধু ভোট খেলায় গুরুত্ব না দিয়ে আন্দোলনে, ত্যাগে, আদর্শে, মানুষের কল্যাণে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পক্ষে, মুক্তিযুদ্ধের ধারায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে অন্যতম রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে দাঁড় হয়েছিল। শুধু সদস্য নয়; বহু বুদ্ধিজীবী, সাংস্কৃতিক কর্মী, সৎ মানুষের সমর্থন লাভও করেছিল। সাধারণ জনসমর্থন বেশ টেনে ছিল। সেই সিপিবি ভেঙ্গে গেল, ভাঙ্গা সিপিবি'র কোন অংশ কতটুকু ঐতিহ্যে, কতটুকু আদর্শে, কতটুকু সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে সমৃদ্ধ হবে তা তাঁদের ভবিষ্যৎ পথ চলায় আরও পরিষ্কার হয়ে উঠবে। তবে এই মুহূর্তে কিছু বিবেচনা তুলে ধরতে চাই।

রাজনৈতিক দল কি শুধু বদলে যাবে, নাকি সমাজ- রাজনীতিকে বদলে ফেলার জন্যে ভূমিকা রাখবে? সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব না দিয়ে শুধু শুধু ফাঁকা বুলি সর্বস্ব আচরণ নিয়ে এক ধরনের বায়বীয় অবস্থান সৃষ্টি করে অকল্যাণধর্মী জনবিচ্ছিন্ন নেতা সর্বস্ব সুবিধেবাদী চারিত্র্য সৃষ্টিতে রাজনৈতিক দলগুলো সীমাবদ্ধ হয়ে পড়বে? এ ধরনের প্রশ্ন সিপিবি ভেঙ্গে যাওয়ার পর বেশি করে মনে পড়ছে।

বলতে দ্বিধা নেই যে, একটি শক্তিশালী কম্যুনিস্ট পার্টি এদেশের রাজনৈতিক

- সামাজিক বাস্তবতায় জনগণের কল্যাণে তৎপর হয়ে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করতে পারে। যারা বলছে –কমিউনিস্ট পার্টির প্রয়োজন নেই, কমিউনিস্ট ভাবাদর্শ আজ মৃতপ্রায়, তাঁরা হয়তো এক ঝড়ো হাওয়ায় অশক্ত- নরম- উদ্ভিদের মত ভেঙ্গে পড়ে আর দাঁড়াবার সাহস পাচ্ছেন না। হয়তো ব্যক্তি সুবিধে মুখ্য ভেবে জনগণের জন্য কল্যাণকর ভুমিকা রাখতে না পেরে দ্বিধাচিত্তে চঞ্চল হয়ে অন্য পথে পা বাড়াতে উদ্যোগী।

আমাদের এদেশে যখন বৈষম্যপীড়িত জীবন আরও দুঃখজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছছে; যখন স্বাধীন ভূমিকায় সরকার ও রাজনৈতিক দলগুলো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারছে না; বহুজাতিক সংস্থাগুলো যখন খবরদারী বাড়িয়ে রাজনৈতিক – নীতি নির্ধারণে কৌশলে অর্থনৈতিক চাপ ও নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টিতে সফল; তথাকথিত ধনিক শ্রেণী সরকারী সুযোগ- সুবিধে আর ভোটের সুবিধে নিয়ে যখন ব্যক্তি – স্বার্থে রাষ্ট্রের সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে ব্যবহার করে চলেছে; তখন আদর্শবাদী সাংগঠনিক শক্তিতে মজবুত কমিউনিস্ট পার্টির নিয়ন্ত্রিত ভূমিকা জরুরী বলেই মনে হয়। শুধু ভোট ভোট খেলায় আর রাজনৈতিক মেলায় হইচই বাঁধিয়ে এ দেশের মানুষের মুক্তি আসবে না।

সিপিবি'র একাংশ আজ কমিউনিস্ট পার্টির নাম বদলিয়ে আদর্শের মুখ্য অনেক কিছুই পরিত্যাগ করে নতুন পদক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার বাসনায় তৎপর। এই তৎপরতা থেকে তাঁদের ভূমিকার কারণেই আরও বিভক্তি আসতে পারে বলেই মনে হয়। এই অংশে আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গিজাত খোলা হাওয়া এমনভাবে বইছে; যে হাওয়ায় অনেকে অনেক ধরনের দুলুনিতে ভুগেছে এবং এখন আরো বেশি করে ভুগছে। চারজন জাতীয় সংসদের সদস্য রয়েছেন —যারা কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন ও বিভিন্ন ধরনের সংশয়ে ভুগছেন বলে জানা যায়। এদের মধ্যে একজন সাংসদ নৌকো প্রতীক নিয়ে ভোটে জিতে গোটা পার্টিকে নিয়ে বিএনপিতে যোগ দেয়ার প্রস্তাব করে অবিভক্ত সিপিবি'র কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে। হায়রে ভোটে জেতা নৈতিকতা! এই নৈতিকতায় কমিউনিস্ট পার্টি শুধু বলি কেন, একটি সুস্থ নিম্নতম আদর্শবাদী রাজনৈতিক দলও গড়ে উঠতে পারে না। এই অংশের সাংসদরা যদি শুধুমাত্র ভোট খেলাকে একমাত্র খেলা হিসেবেও মনে করে রাজনৈতিক পোশাক পাল্টিয়ে ভোট খেলায় আবারো খেলতে উদ্যোগী হোন, তাতে করেও তাঁদের এতদিনের রাজনৈতিক ভূমিকা ম্লান হয়ে পড়বে এবং এক ধরনের নিম্নমানের দেউলিয়াপনার উদাহরণ সৃষ্টি হবে।

রূপান্তরবাদীর চিহ্ন দেহে এঁকে নিয়ে যদি রূপান্তরের মানসে সুনির্দিষ্টভাবে রূপান্তর হওয়ার সংহত দলীয় প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে বিভিন্নমুখী আদলের রূপান্তর দেখা

যায়— তবে বলবো, এতে রাজনৈতিকভাবে এক বিয়োগান্ত পরিণতিকে পরিপূর্ণ করা হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির আদর্শ, কর্মসূচী, সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে অপ্রধান ও বৈশিষ্ট্যহীনভাবে উদার বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গি নির্ভর নতুন ধারা সৃষ্টি করে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে আরও একটি বড় দল তৈরি করা বাস্তবতার নিরিখে কতটুকু যুক্তিযুক্ত, তা ভাববার বিষয়। যেখানে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি'র মত দলের অস্তিত্ব ক্রিয়াশীল। কমিউনিস্ট পার্টির অনেক স্বনামধন্য মেধাবী নেতা থাকার পরও যারা দু'একজন নামকরা লোকের পিছনে গিয়ে ব্যক্তি ইমেজে ও সাততালি দিয়ে তৈরি করা দলে ভিড়তে চান, তাঁরা যে আর একবার ভুল- বেদনায় কাতরাবেন, তা বলা চলে।

পঁচাত্তর সালের পর মোজাফফর ন্যাপ ভেঙ্গে একতা পার্টি, আবার গণতন্ত্রী পার্টি— এ ধরনের ক্ষীয়মান ধারা যদিও সৃষ্টি হয়েছে, সে ধারা বেগবান হয় নি; সেই ধারাকে সমন্বিত করেও কি এখন রূপান্তরবাদী কমিউনিস্টরা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে পারবেন, যতটুকু পারতেন কম্যুনিস্ট পার্টির সচল-বেগবান ধারাকে অবলম্বন করে?

ডঃ কামাল হোসেনের নেতৃত্বে যে রাজনৈতিক দলের ভিত্তিমূল গড়ে ওঠার প্রচেষ্টা চলছে — তা জনগণের বিভিন্ন প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড়াতে হবে। এইসব প্রশ্নের মুখোমুখি হয়ে বিভিন্ন ছোট- ছোট নিষ্ক্রিয় দল, ব্যক্তি ও শক্তির নির্ভরতায় যে রাজনৈতিক শক্তির উত্থানের স্বপ্নে বিভোর হয়ে পড়ছেন কোন কোন রূপান্তরবাদী কমিউনিস্ট; তা জনগণের গ্রহণযোগ্যতায় অদূর ভবিষ্যতে বেশ শক্তিশালী হবে না। ইতিমধ্যে অনেক বুদ্ধিজীবী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ডঃ কামাল হোসেনের প্রক্রিয়া থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। এখন যারা রয়েছেন প্রথম সারির নেতৃত্বে তাঁদের বেশিরভাগ ছিলেন আওয়ামী লীগের নিষ্ক্রিয় বা বিভিন্ন কারণে আওয়ামী লীগ থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা জনগণ থেকে দূরবর্তী অবস্থানে অধিষ্ঠিত শ্রেণী- চারিত্রের মানুষজন।

সিপিবি'র অপর অংশ যারা কম্যুনিস্ট ভাবাদর্শকে ভিত্তি করে সৃজনশীল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এগিয়ে যেতে চান তাঁদের সামনেও এগিয়ে যাওয়ার চ্যালেঞ্জ রয়েছে। সময় নষ্ট না করে সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডকে গুরুত্ব দিয়ে দৃঢ়চিত্তে দৃঢ়পায়ে এগিয়ে যাওয়ার কোন বিকল্প নেই। এদেরও প্রমাণ করতে বে যে, নেতৃত্বের দ্বন্দ্বে নয়, আর্দশের দ্বন্দ্বে; ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে জনগণের জন্যই কমিউনিস্ট পার্টির ঐতিহ্যকে উর্ধ্বে তুলে ধরার মানসে পার্টিকে আরও শক্তিশালী করার জন্য তৎপর হতে হবে।

কমিউনিস্ট পার্টির বিভাজন প্রক্রিয়ায় অনেক সদস্য - সমর্থক আজ থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে, এদের অবস্থানকেও নষ্ট করে বিভ্রান্তির চোরাবালিতে ঠেলে দেয়া সমীচীন নয়; এঁদের টেনে আনতে হলে জোরালো স্বচ্ছ — ভূমিকা পালন করতে হবে।

বৈষম্যপীড়িত ব্যবস্থা উচ্ছেদের আন্দোলনে, সাধারণ মানুষের কল্যাণে, শ্রমজীবী মানুষের বাঁচবার পথ বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে সংহত করার জন্য— সিপিবি'র মত কমিউনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব-বিকাশ অনাকাঙ্ক্ষিত হতে পারে না। ❑

২১ আষাঢ় ১৪০০
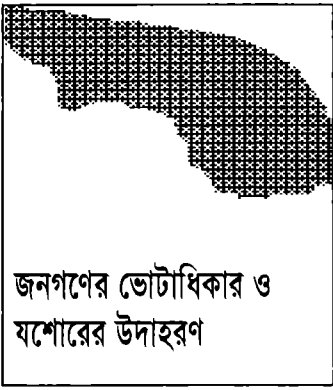
জনগণের ভোটাধিকার ও যশোরের উদাহরণ

প্রধানমন্ত্রী মেঘনা-গোমতী সেতু উদ্বোধনকালে বলেছেন যে ঃ 'এমন দিন দূরে নয় সেদিন সড়কপথে কোথাও আর ফেরি থাকবে না।' ভালো কথা। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো হলে যাতায়াতের সুবিধে হবে। কিন্তু রাজনৈতিক ব্যবস্থায় আজ সেতু নেই, এমন কি ফেরিও নেই। যাকে বলে অচলাবস্থা। এরমধ্যেই যশোরে সাংসদ রওশন আলীর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে যেসব নাটকীয় ঘটনা ঘটলো, তাতে বিএনপি শাসিত ভোট ব্যবস্থায় আস্থা রাখা তাঁর পক্ষেই সম্ভব, যে বিএনপি ছাড়া আর কোনো দলের সাংসদকে সংসদ ভবনে দেখতে চান না।

যশোর-৩ আসনে সাংসদ হিসেবে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত রওশন আলী নির্বাচিত হয়ে তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে দীর্ঘদিন চলে গেল কিন্তু রওশন আলীর মৃত্যুর পর দুঃখজনকভাবে বিএনপি তাদের সুতোর জোরে পুতুল নাচের আবহ সৃষ্টি করে মন্ত্রী তরিকুল ইসলামকে সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত করার প্রয়াস পায়।

পূর্বের ঘটনা টেনে আনলে দেখা যায়, আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট রওশন আলীর কাছে তরিকুল ইসলাম ২৯৭ ভোটে পরাজিত হন। এসময়ে তিনি নির্বাচনে কারচুপি, সন্ত্রাসের অভিযোগ এনে ভোট পুর্নগণনার আবেদন জানিয়ে নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে মামলা দায়ের করেন। সাড়ে তিন বছর পর সাংসদ রওশন আলীর মৃত্যুর পর সেই মামলা প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে! এই মামলার কারণে ৩০ আশ্বিন ১ ও ২ কার্তিকে ভোট পূর্নগণনা করা হয়। ২৭৭ ভোটে তরিকুল ইসলাম এগিয়ে আছে বলে তার সমর্থকগোষ্ঠী আনন্দ মিছিলও বের করে। অন্যদিকে ৫ কার্তিক ঐ মামলার সর্বশেষ শুনানি চলে ৬ ঘন্টাব্যাপী। মামলায় ৮১ জনের সাক্ষ্য নেয়া হয়, অতঃপর ৭ কার্তিক নির্বাচনী ট্রাইব্যুনালে জাতীয় সংসদের যশোর-৩ আসনে ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী তরিকুল ইসলামের নির্বাচনী মামলা খারিজ হয়ে যায়। মামলা খারিজের পর আরও নাটকীয় ঘটনার মধ্যে দিয়ে মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম সাংসদ হিসেবে চিহ্নিত হন।

প্রয়াত সাংসদ রওশন আলীর পক্ষে নির্বাচনী ফলাফল অপরিবর্তিত থাকায় মরহুমের মর্যাদা বেড়েছে। মৃত্যুর পর তার মর্যাদাকে নিয়ে যেভাবে টানা - হেঁচড়া করা হলো, তাতে শুধু ভোট-ব্যবস্থার আরও দুঃখজনক পরিনতি আমরা লক্ষ্য

করলাম না, লক্ষ্য করলাম একজন বিজয়ী সাংসদ দীর্ঘদিন তাঁর দায়িত্ব পালন করার পর, মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যে কিভাবে দংশনপ্রিয় মনোভাবের কাছে দংশিত হন। তবে ভোট ব্যবস্থায় যশোরের এই উদাহারণ এমন একটি উদাহরণ যা বিএনপি শাসিত নির্বাচনী ব্যবস্থাকে আস্থাহীনতার কবলে জোর করে ঠেলে দিয়েছে।

যশোরের জনগণ প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেছেন। ৬ কার্তিক ভোট পুর্নগণনার প্রতিবাদে যশোরে আওয়ামী লীগের ডাকে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়েছে। যশোরে বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ভোট পুর্নগণনাকে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করে ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয় ঘেরাও করে ও স্মারকলিপি পেশ করে। অন্যান্য রাজনৈতিক দলও প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করে। যশোরের জনগণ ও রাজনৈতিক দলগুলোর সচেতন প্রতিবাদী ও উদ্যোগী ভূমিকার কারণে আস্থাহীন উপ-নির্বাচনে একমাত্র বিএনপি ছাড়া আর কোনো দল বা ব্যক্তির পক্ষ থেকে মনোনয়নপত্র জমা পড়ে নি। সে কারণে বিএনপি'র দলীয় প্রার্থী তরিকুল ইসলাম বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিনা খরচে বিনা ভোটে ফাঁকা মাঠে সাংসদ হয়ে উঠলেন। এই সাংসদ হয়ে ওঠার পেছনে যেসব কার্যকারণ সম্বলিত চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে, তাতে শুধু ভোট-ব্যবস্থা নিরাপদ নিরপেক্ষ করার জন্যে কালো টাকা, পেশীশক্তি ও প্রশাসনের প্রভাব রহিত করলে চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে শাসকদলের নিয়ন্ত্রণমুক্ত ব্যবস্থাও জরুরী। বিএনপি যতই গণতন্ত্রের কথা বলুক না কেন, তাদের সৎ ইচ্ছে নেই বলে মাগুরা নির্বাচনসহ পরবর্তী উপনির্বাচনগুলোতে মানুষের আস্থা কমেছে। বগুড়ার উপনির্বাচনেও তারই প্রভাব আমরা লক্ষ্য করেছি। এসব কারণে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি বিরোধীদলগুলোর কাছে গুরুত্ববহন শুধু করছে না, জনগণের দাবি হিসেবে তা পরিগণিত হয়েছে।

ভোট ব্যবস্থাকে বার বার শাসকগোষ্ঠী তাদের প্রয়োজনে কাজে লাগিয়েছে। ভোটের সীল ব্যালট পেপারে লাগানো মহড়া দিয়ে নিজের গায়ে সেই সীল লাগিয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে শাসন করার ক্ষমতা হাতে নিয়ে এক ধরনের তথাকথিত গ্রহণযোগ্যতা অর্জনে ক্ষমতালোভী মহল বার বার উৎসাহী হয়। বঙ্গবন্ধুর হত্যার পর কয়েকটি রাষ্ট্রপতি ও সংসদ নির্বাচনে এই অবস্থা আমরা লক্ষ্য করেছি। তবে বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আওতায় তুলনামূলকভাবে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। তবে সেই নির্বাচনকেও কালো টাকার হাত থেকে বাঁচানো যায় নি। কালো টাকা নির্বাচনকে খুবই জোরালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

আজ বিএনপি অন্যান্য দলের মোট ভোটের চেয়ে তুলনামূলকভাবে কম ভোট পেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত। এমনকি এককভাবে আওয়ামী লীগের চেয়ে কম ভোট

পেয়ে বিএনপি ক্ষমতার স্বাদ গ্রহণ করছে। এছাড়াও বিএনপি জামাতের সখ্য ও সমর্থনে সরকার গঠন করেছে। এই অবস্থায় বিএনপি কি জনসমর্থন ও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার প্রক্রিয়াকে চোখ খুলে দেখছে না। আসলেই তারা অন্ধের মত নিজেদের চেহারা দেখতে পাচ্ছে না বলেই—তাদের পক্ষেই জনগণ আছে বলে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে বিএনপির নেতারা বক্তৃতার মঞ্চ থেকে শুরু করে টেলিভিশনের পর্দা কাঁপিয়ে তুলছেন। এই কাঁপা কতটা ফাঁপা তা যশোরের সাম্প্রতিক ঘটনা থেকে আঁচ করা যায়।

১৭ কার্তিক পত্রিকায় লক্ষ্য করলাম যে, তরিকুল ইসলামকে সাংসদ হিসেবে যশোরের বিরোধী দলগুলো এখনো গ্রহণ করে নি বলে যশোরের বইমেলা তাঁরা বর্জন করেছে। এই বইমেলায় প্রধান অতিথি হিসেবে তরিকুল ইসলাম উদ্বোধন করবেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। আওয়ামী লীগ, বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ও অন্যান্য দল বলেছে, মৃত-ব্যক্তির ভোট চুরির অপচেষ্টা ও উপ-নির্বাচনে সাধারণ মানুষকে পাশ কাটিয়ে যে ব্যক্তি জাতীয় সংসদ — সদস্য হওয়ার স্বপ্ন দেখে, সেই গণধিকৃত ব্যক্তির উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত কোনো অনুষ্ঠানে আমরা অংশ নিতে পারি না।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের যশোর-৩ আসনের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নেতা এডভোকেট রওশন আলী জয়ী হয়েছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পর যখন সেই বিচারপতি শাহাবুদ্দিনের নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার নেই, তখন বিএনপি শাসিত সরকারের মন্ত্রী তরিকুল ইসলাম মৃত-সাংসদের পর জীবন্ত-সাংসদ হিসেবে উপনির্বাচনে এককভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছাড়া নির্বাচিত হলেন। এর ফলে জীবন্ত হলো এমন এক ভোটব্যবস্থার উদাহরণ, সে উদহারণে মৃত্যু হল বিএনপি শাসিত ভোট ব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থার। যশোরের এই উদাহরণ শুধু একজন ব্যক্তির সাংসদ হওয়ার প্রতিচ্ছবিকে তুলে ধরে না, এই উদাহরণে বিএনপি সরকারের মনোভাব, আন্তরিকতা, ভোট সুষ্ঠু করার ক্ষমতা ও উদ্যোগ ছাপিয়ে উঠেছে। এই অবস্থায় ভবিষ্যতে যে কোনো নির্বাচন বিএনপি সরকারের তথাকথিত গণতন্ত্র নামীয় ব্যবস্থায় করা যুক্তিহীন ও অর্থহীন হয়ে পড়বে বলেই মানুষ আশংকা করছে। ❑

২০ কার্তিক ১৪০১
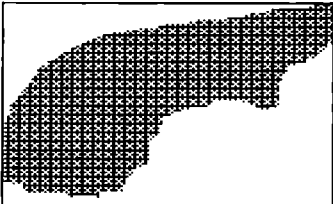
বিএনপি'র অস্ত্র, বুমেরাং হয়ে আঘাত হানছে

বিএনপি পুরনো আর বাজে অস্ত্র নিয়ে খেলছে, যে অস্ত্র বুমেরাং হয়ে যাচ্ছে এবং তাদেরই আঘাত হানছে। বিরোধীদলের সংসদ বর্জন যখন একটি গ্রহণযোগ্য দাবির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, তখন সুতোর টানে আইনের নামে এক ধরনের ধূলো-ঝড় বইয়ে দিয়ে সচেতন মানুষের চোখ- দৃষ্টি নষ্ট করা কি সম্ভব? সম্ভব নয়। তবুও বিএনপি আইন নির্ভরতার নামে বিচার বিভাগীয় প্রতিষ্ঠানকে টেনে নিয়ে রাজনৈতিক চাল চালবার কাতরতা দেখিয়ে শুধু ভুল করে নি, বিচার বিভাগের প্রতি সাধারণ মানুষের আস্থাকে নষ্ট করেছ। বিএনপি এ ক্ষেত্রে একচক্ষু হরিণের মত পক্ষভুক্ত করেছে বিচার বিভাগকে।

গত ২৭ অগ্রহায়ণ হাইকোর্টের একটি ডিভিশন বেঞ্চ বিরোধীদলের লাগাতার সংসদ বর্জনকে অবৈধ ঘোষণা করেছিল। এক রায়ে তারা বিরোধী দলের নেতাদের সংসদের পরবর্তী অধিবেশনে যোগ দেয়ার নির্দেশও দিয়েছিল। কিন্তু ২৮ অগ্রহায়ণ বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আপীল বিভাগ বিরোধী দলের সংসদ বর্জন সংক্রান্ত মামলার রায়ের কার্যকারিতা ১ মাঘ পর্যন্ত স্থগিত ঘোষণা করেছে। প্রচলিত আইনের ধারায় এ মামলা হয়তো চলবে। আইন সম্পর্কে বেশি মন্তব্য না করেও বলা যায় যে, বিরোধীদলের বর্তমান আন্দোলনের সঙ্গে এই মামলার সম্পর্ক রয়েছে। বিরোধী দলের সংসদ বর্জনের বিরুদ্ধে এই মামলা একটি অস্ত্র হিসেবেই ব্যবহার হচ্ছে, এই অস্ত্র হয়তো আইনের পরিপূরক হতে পারে বা নাও হতে পালে। যে বা যারা এই মামলা করেছেন, তার বা তাদের অধিকার সংরক্ষণ ও বিকাশের লক্ষ্যেই এই মামলা দায়ের হয়েছে? বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই মামলা অন্যান্য সাধারণ মামলার মত বলে মনে হচ্ছে না। এর ব্যঞ্জনা অন্য ধরনের এই মামলায় সম্পর্কিত হয়ে বিরোধী দল ও বিএনপি যেন দুই অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। মনে হয় তারা বাদী ও বিবাদী। মামলার দুইদিকে দুই ধরনের দলীয় পক্ষগ্রাহী অবস্থান। কিন্তু বিএনপি এই মামলাকে কেন্দ্র করে যে অবস্থানে চলে এসেছে তাতে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মামলাকে অস্ত্র ভেবে বিএনপি বিরোধী দলকে যতটা ঘায়েল করতে চেয়েছিল, তার অনেকগুণ বেশি ক্ষতি নিয়ে বিএনপি পর্যদুস্ত হয়েছে।

রাজনৈতিক আন্দোলনের গতিধারায় সৃষ্ট মামলা যখন নিস্পত্তি বা গ্রহণ করা

হয়, তখন বিভিন্ন প্রশ্ন টেনে আনে মানুষ তাঁর মস্তিষ্কে। এতে বিচার বিভাগ সহজেই বিতর্কিত হয়ে পড়ে। রাজনৈতিক বিষয়, রাজনৈতিক আন্দোলন ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়ক আন্দোলনের সময়ে সংসদ বর্জন বিষয়ক বিষয়টি কোর্টের বিচারে এনে বিশেষ করে সংকটময় রাজনৈতিক সময়ে তা কোর্ট নির্ভর বিবেচনায় ছেড়ে দেয়া কতটা যুক্তিযুক্ত তা ভাববার বিষয়।

মামলাকে কেন্দ্র করে বিএনপির দলীয় নিয়ন্ত্রণ বিচার বিভাগকে যে অনেকটা পক্ষপাতদুষ্ট করেছে বলে বিরোধী দলীয় অভিযোগ তা সত্য উদাহরণে পরিণত হয়েছে; যেমন ঃ বিচারপতি কাজী এটি মনোয়ার উদ্দিন, যিনি হাই কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি নিযুক্ত হবার আগ পর্যন্ত বাগেরহাট বিএনপির সভাপতি ছিলেন। বিরোধী দলের লাগাতার সংসদ বর্জনকে অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি কাজী এটি মনোয়ার উদ্দিন ও বিচারপতি কাজী শফিউদ্দিন সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ। এ ধরনের স্পর্শকাতর ও রাজনৈতিক উত্তপ্ত ঘটনায় উৎসারিত মামলা এমনিতেই মানুষ ভিন্ন চোখে দেখে, এরপর আবার তা এমন এক বিচারপতির বিবেচনায় আনা হয়, তা অনিরপেক্ষ ও দলীয়তায় দলবাঁধা বলেই মানুষ ভাবতে থাকে।

যেদিন সংসদ বর্জনকে অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেয়া হয়, সেদিনই বিচারপতি মনোয়ারের বাসভবন কে বা কারা কটি বোমা নিক্ষেপ করে। ঘটনার কিছুক্ষণ পর বিচারপতি মনোয়ার তাঁর বাসভবনে আসেন। তিনি অপেক্ষমান সাংবাদিকদের বলেন, রায়ে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ মামলা করতে পারে। ঐ সময়ে ছাত্রদলের সভাপতি ফজলুল হক মিলনসহ কয়েকজন ছাত্রদল নেতা তাঁর পাশে ছিলেন। এ ধরনের পরিবেশ- প্রতিবেশ কি ঐক্যসূত্র তুলে ধরে তা ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই।

একদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও সংকট। অন্যদিকে চিহ্নিত একটি মামলার মধ্যে দিয়ে যে পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হলো, তা কতটুকু রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে যুক্তিগ্রাহ্য শুভ পদক্ষেপ? বরং মামলার মধ্যে দিয়ে বিরোধী দলকে শায়েস্তা করার মনোভাব ফুটে উঠেছে। আইনের মারপ্যাঁচে সমাজে বহু নিরীহ লোক বা সামর্থহীন মানুষেরা ধকল সহ্য করে, বিপদে পড়ে। মতলবি মামলায় অনেকে টানা- হেঁচড়া হয়। এইসব বাস্তবতা আছে বলেই এখনো আইনের সাম্য বিস্তৃতভাবে অর্জন করা সম্ভব হয় নি। এই বাস্তবতা কোলে নিয়ে কি বিএনপি তক্কে তক্কে ঝোপ বুঝে কোপ মারতে উদ্যত? এমন মনোভাব সংকটের বেলাভূমিকে আরও দীর্ঘ করবে।

বিএনপির প্রধান নেত্রী থেকে শুরু করে তৃতীয় শ্রেণীর নেতারাও বলে থাকে, তারা রাজপথের ভয় করে না। প্রধান মন্ত্রী রাজপথে বলে ফেললেন, 'এরাই যথেষ্ট।' পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ জবাব দিল সমাবেশকে সমাবেশ দিয়ে। রাজপথের খেলায় বুমেরাং হয়ে গেল প্রধানমন্ত্রীর অস্ত্র। সংসদের শক্তি-অহমিকা বিএনপিকে জানি নে কতটুকু অন্ধ করে রেখেছে? তবে ইতিমধ্যে বিরোধী দলগুলোর লাগাতার বর্জনে বাস্তবে সংসদ একদলীয় সংসদে পরিণত হয়েছে। ১৪ পৌষ বিরোধী দল যদি সংসদ থেকে পদত্যাগ করে, তবে সংসদের গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু থাকবে তা সহজে অনুমেয়। বিরোধীদল ছাড়া সংসদ নিয়ে বিএনপি তখন যতই কৌশল গ্রহণ করে গণতন্ত্রের অপূর্বতায় মুগ্ধ হয়ে নিজের অনন্যতা জাহির করতে চাইবেন, ততই আর এক বুমেরাং বিএনপিকে ক্ষতবিক্ষত করবে।

নিনিয়ান নামীয় সংলাপ অসফল হয়েছে। বিএনপি সেটাও অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ব্যর্থ হয়েছে। এর মধ্যে দলাদলিহীন বিচার বিভাগ সম্পর্কে মানুষের প্রশ্নকে উসকে দিয়েছে যে মামলা, সেটাও শেষমেষ বিএনপির পক্ষে যায় নি। বুমেরাং হয়ে এই মামলা দেখা দিয়েছে, সেটা সামলানো দুষ্কর হয়ে পড়বে।

বিএনপি কচিকাঁচার মত অস্ত্র ব্যবহার করেছে একের এর এক, যেসব অস্ত্র পুরনো, অসমর্থ আর লক্ষ্যহীন। এইসব অস্ত্র সাম্প্রতিক সময়ের রাজনৈতিক সংকটে আর বিরোধীদলের সম্মুখে নিতান্তই অসংগত ও অতুল্য। এমন নাজুক অবস্থায় আর কোনো অস্ত্র ব্যবহার না করাই বিএনপির পক্ষে শ্রেয় বরং বিরোধীদলের দাবি মেনে নিয়ে বুমেরাং-আঘাত থেকে নিজকে বাঁচিয়ে রাখার ত্বড়িত উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। বিএনপির এই বোধোদয় হলেই বরং সংকট কেটে গিয়ে সূর্যোদয় হবে। ❑

১৪ পৌষ ১৪০১

বিপ্লবীদের সম্মাননা ও বাউরী বাতাস

ঢাকা নগরে প্রায় প্রতিদিন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান হয়ে থাকে, বিশেষত শীতের মৌসুমে অনুষ্ঠান বেশি মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু সে দিনের একটি অনুষ্ঠান ছিল ব্যতিক্রম-ধারা বৈশিষ্ট্য নিয়ে উজ্জ্বল। এই উজ্জ্বলতা আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, যাদের ঘিরে এই অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়েছিল তাঁদের উপস্থিতিতে বা তাঁদের নামের গৌরবে। ২৫ মাঘ ১৪০০ শীতের বিকেলে ঢাকার শাহবাগস্থ জাতীয় যাদুঘর মিলনায়তনে উল্লিখিত অনুষ্ঠানটি শুরু হয়ে বেশক্ষণ চলেছিল, গোটা মিলনায়তন উপচে পড়া মানুষের উপস্থিতিতে। এক ধরনের আবেগ, অনুভূতি, আগ্রহ নিয়ে সে অনুষ্ঠানে আমি উপস্থিত ছিলাম, আমার মত অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

বিপ্লবী কৃষক নেতা জিতেন ঘোষের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে 'জিতেন ঘোষের কল্যাণ ট্রাস্ট' আয়োজিত অনুষ্ঠানটিতে দেশের কয়েকজন বিপ্লবীকে সম্মাননা জানানো হয়। উদ্যোগীদের ভাষায় 'আত্মনিবেদিত দেশকর্মী সম্মাননা' বলে তা উল্লেখ করা হয়। কারা এই দেশকর্মী? যারা তাঁদের জীবনকে এদেশের মানুষের মুক্তি আন্দোলনে নিবেদন করেছেন।

যাঁদের জন্যে এই সম্মাননা, তাঁরা হলেনঃ ডাঃ আবদুল কাদের, বারীন দত্ত, সন্তোষ ব্যানার্জি, মোখলেছুর রহমান, বরুণ রায়, আবদুর রেজ্জাক, পূর্ণেন্দু কানুনগো, অনঙ্গ সেন, শরদিন্দু দস্তিদার, নুরুল ইসলাম মুন্সী, রাখাল ব্যানার্জি, অমল সেন, আবদুল মতিন (ভাষা আন্দোলন), হেনা দাশ, সুনীল রায়, পীর হাবিবুর রহমান, সরদার আবদুল হালিম, সরদার ফজলুল করিম, ফজলুল হক খোন্দকার, আবদুল হক, শাহেদ আলী, ফয়েজ মাস্টার, মোকছেদুর রহমান, মনিন্দ্রনাথ গোস্বামী, রবি নিয়োগী, ছয়ের উদ্দিন, জসীম উদ্দিন মন্ডল, এস এম সুলতান ও রণেশ দাশ গুপ্ত। এদের মধ্যে কয়েকজন অসুস্থতা ও অন্যান্য কারণে উল্লিখিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হরে পারেন নি।

যাদের সম্মাননা জানানো হয়েছিল, তাঁদের প্রায় সকলেই রাজনৈতিকভাবে সাংগঠনিক বা দলীয় প্রক্রিয়ায় বা ভাবাদর্শের জন্যে জীবনে উল্লেখযোগ্য সময় শুধু বলবো না, বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন। এঁদের বেশিরভাগই বামপন্থী-দৃষ্টিভঙ্গী- নির্ভর কর্মকাণ্ডে মানুষের মুক্তির কথা বিবেচনায় এনে শ্রম, মেধা ও

সময়কে কার্যকরভাবে কাজে লাগিয়েছেন। আরও সুনির্দিষ্টভাবে যদি বলি তবে বলা যায় যে, এঁরা সমাজতন্ত্রের জন্যে বা সমাজতান্ত্রিক চেতনাকে নিজেদের মধ্যে টেনে নিয়ে মানুষের মুক্তি- আন্দোলনকে সমৃদ্ধ বা বিকাশের জন্যে লড়েছেন। এ সত্য কথাটি এঁদের প্রায় প্রত্যেকের জন্যে সম্পর্কিত। কিন্তু 'সম্মাননা' অনুষ্ঠানের উদ্যোগী আয়োজকদের আলোচনায় বা 'জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর সভাপতির নাম যুক্ত ছাপা বক্তব্যেও 'সমাজতন্ত্র' নামক শব্দটি আসে নি বা তাঁরা যে একদা 'সমাজতন্ত্র' নামক আন্দোলন বা কর্মকাণ্ডে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন বা অনেকে এখনো করছেন; সেই কথাটা মনে হয় ইতিহাসের কণ্ঠলগ্ন হয়ে আসা জরুরী ছির। কেননা উদ্যোগী ট্রাস্টের সভাপতি বলেছেন- 'আমরা চাই আমাদের প্রজন্ম এবং আমাদের উত্তরসুরীরা পূর্বসূরী দেশপ্রাণ এই সকল গণনায়কদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে অবহিত হোক।' এই যখন দৃষ্টিভঙ্গী তখন এইসব 'সম্মাননা' জানানো প্রবীণ বিপ্লবীদের পরিচয় আরও পরিষ্কারভাবে তুলে ধরতে হলে বা সত্যের খাতিরে বলতেই হবে যে, সমাজতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বলিয়ান হয়েই এঁদের প্রায় সকলেই দেশের জন্যে, জনগণের সুখ ও শান্তির জন্যেঃ ভাষা আন্দোলনে, মুক্তিযুদ্ধে, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, তেভাগার সংগ্রামে, প্রবহমান আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছেন। 'মানবতাবোধ' বা 'দেশপ্রেম' এ ধরনের সরলরৈখিক শব্দের মধ্যে দিয়ে এসব বিপ্লবীদের চারিত্র্য বা বৈশিষ্ট্য সঠিকভাবে তুলে ধরা যায় না বা যাবে না। এজন্যে তাঁদের ভূমিকাকে আরও সুনির্দিষ্ট বা স্তর বিন্যাসে তুলে ধরা দরকার। তবে অনুষ্ঠানের উদ্যোগীজন হয়তো বলবেন; পরবর্তীকালে তা করা হবে বা বিষয়টি তাদের দৃষ্টিভঙ্গীজাত নয়।

'সমাজতন্ত্র' শব্দটি আজ অনেকের মুখে আসতে যেন স্পর্শকাতরতায় কাতরায়, অনেকে 'সমাজতন্ত্র' নামক শব্দটি দূরে ঠেলে দিয়ে কৌশলে বড় বড় বুলি উচ্চারণ করে 'সময়োপযোগী' নামের বাদ্য বাজাতে ইচ্ছে পোষণ করেন। আবার এদের কেউ কেউ নিজেদের বেলুন ফোলানোর প্রয়োজনে যখন তখন উত্তর-দক্ষিণের বাউরী বাতাস গোগ্রাসে গিলে খাওয়ার মত টেনে নেন; বাতাস হলেই হল! এসব কথা মনে পড়েছে — বিপ্লবীদের সম্মাননা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে। কেননা ট্রাস্টের সভাপতির ভাষণে যদিও তিনি বলেছেন- 'আমরা চাই মতাদর্শের বৈচিত্র্য এমনকি বৈপরীত্য সত্ত্বেও তাঁদের তর্কাতীত দেশপ্রেম, অসাধারণ আত্মত্যাগ, পরম নিষ্ঠা এবং অসম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ও মানবিক মূল্যবোধসমূহ.... নতুন নুতন প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করুক, উদ্বুদ্ধ করুক।'

আমি বলবো যে, যাঁদের এবার সম্মাননা দেয়া হল তাঁদের নামের তালিকা দেখে পাঠক মাত্রই বিবেচনা করতে পারবেন যে, এঁদের মধ্যে মতাদর্শগত-

ব্যবধানটা কম, এঁরা যেন প্রায় সকলেই একই সুতোয় একেকটি ফুল, যে ফুলের গন্ধ, সৌন্দর্য, পাপড়ী প্রায় একই। আরো খোলামেলাভাবে বলবো যে, সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের কারণেই এঁদের আত্মত্যাগ, দেশপ্রেম, অসম্প্রদায়িক চেতনা, গণতান্ত্রিক ও অন্যান্য মূল্যবোধ বিশেষভাবে গড়ে উঠেছে। সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের ভিত্তিতেই এঁরা বিপ্লবী হয়ে উঠেছেন। তাঁদের চেতনার প্রবাহ সমৃদ্ধ হয়েছে। এসব কথা না বললে, সম্মাননা জানানো এসব বিপ্লবীদের আদল পুরোপুরি আসে না।

জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাস্টের উদ্যোগীদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাতে হয় যে, তাঁরা ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়ে বিপ্লবীদের মর্যাদাকে সীমাবদ্ধভাবে হলেও নতুন প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণামূলকভাবে তুলে ধরেছেন। বর্তমানের যে সব রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান রয়েছে, সেইসব প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক যারা, তাদের ভূমিকায় এইসব বিপ্লবীদের জন্যে কোন মনোযোগী কর্মকাণ্ড আশা করা যায় না। সেই বিবেচনায় ট্রাস্টের উদ্যোগ সামাজিকভাবে গুরুত্ব বহন করে। এই ট্রাস্টের পক্ষ থেকে ঢাকার উত্তরা মডেল টাউনে পাঁচ কাঠা জমির ওপর 'অমৃত সদন' নামে একটি ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই ভবনটি উদ্বোধন করেন দেশের বরেণ্য শিল্পী এস এম সুলতান। এই ভবনে আপাতত ১০ জনের থাকার ব্যবস্থা আছে। প্রবীণ বিপ্লবীদের এই আশ্রয়স্থল বিভিন্ন প্রয়োজনে কাজে লাগবে, অন্তত অসুস্থ হলে অমৃত সদন-এ অবস্থান নিয়ে চিকিৎসার কাজটা করা যাবে। এইসব বিপ্লবীদের জন্যে সরকারী কোন বিশেষ ব্যবস্থা নেই, অন্তত তাঁদের ভূমিকাকে সম্মান জানানোর জন্যে; এটা আশা করারও ঠিক হবে না। এখানে বলে রাখা ভালো যে, এসব বিপ্লবীরা কোন রাষ্ট্রীয় পুরস্কার, সম্মাননা বা ব্যক্তিগত সুবিধের জন্যে জীবনকে মানুষের কল্যাণে একাকার করেন নি; এ ধরনের কথা স্পষ্টভাবে সেদিনের সম্মাননা অনুষ্ঠানে ক'জনের কণ্ঠ থেকেও উচ্চকিত হয়েছিল। তবুও বলবো—নতুন প্রজন্মের পক্ষ থেকে এইসব বিপ্লবীদের কর্মকাণ্ডকে মর্যাদার সঙ্গে তুলে ধরে তাঁদের জন্যে ভূমিকা গ্রহণ করা সম্মানজনক কাজ বলেই চিহ্নিত করা যায়। বিপ্লবীদের জন্যে শুধু ঢাকায় নয়, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে 'জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাস্ট'-এর মত উদ্যোগ গ্রহণ করে আজকের তরুণ-যুবকরা নিজেদের অতীত গৌরবকে সমৃদ্ধ করে ভবিষ্যত পথ-চলাকে দৃঢ় ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারে।

জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাস্ট-এর মাধ্যমে যেসব বিপ্লবীদের এবার সম্মাননা জানানো হল তাতে এই তাৎপর্য ফুটে ওঠে যে, এইসব বিপ্লবীদের নিবেদিত ভূমিকায় আমাদের ইতিহাস, রাজনীতি, মুক্তি-আন্দোলন যেমন সমৃদ্ধ হয়েছে; ঠিক তেমনি ভবিষ্যতমুখী ইতিহাস, রাজনীতি ও মুক্তি আন্দোলন এঁদের প্রতি শ্রদ্ধা

জানিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এঁদের ভূমিকা, ভাবাদর্শ সততার মধ্যে দিয়ে গৌররেব উজ্জ্বলতা ছুঁয়েছে; যে সততা বর্তমানে আমাদের রাজনৈতিক বা দেশকর্মীদের জন্যে জরুরী বিষয় বলে চিহ্নিত করা যায়।

শেষে বলবো — যে বিপ্লবী প্রয়াত জিতেন ঘোষের নামে 'জিতেন ঘোষ কল্যাণ ট্রাস্ট' গঠন হয়েছে এবং বিপ্লবী জিতেন ঘোষের ১৮তম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে যে বিপ্লবীদের সম্মাননা জানানো হয়েছে — তাঁদের সকলের ঐতিহ্য ধারায় নতুন প্রজন্ম জেগে উঠুক ও এই জেগে ওঠা অনুরণনে এ দেশের মানুষের মুক্তি আন্দোলন বেগবান হোক। ❑

৬ ফাল্গুন ১৪০০

েটি
য়
্য।
কের

ার বাণী
জ্ঞ।

্য বই

নার সময়

স্পাতে